বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়

সপ্তম শ্রেণি

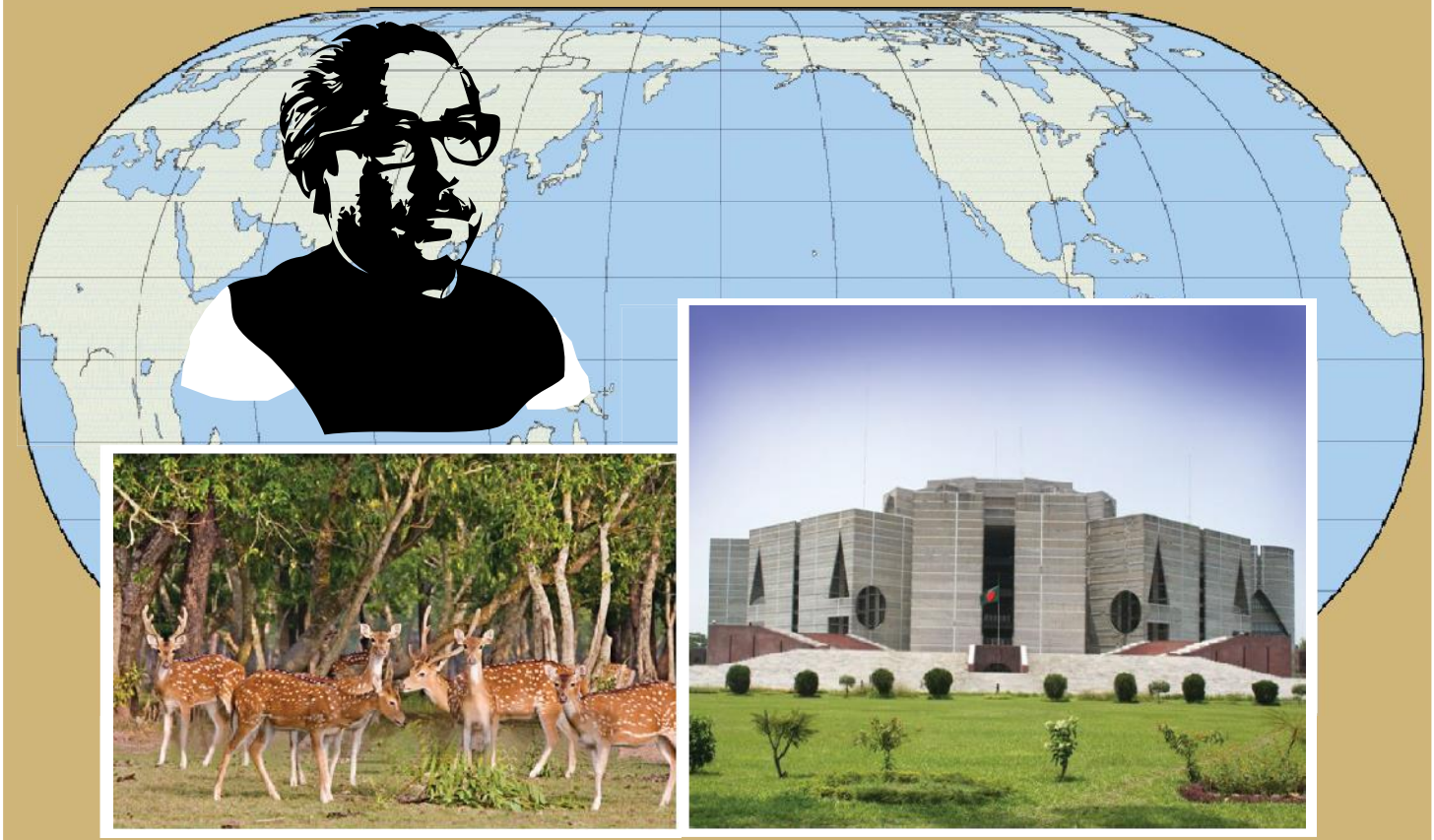

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০১২ শিক্ষাবর্ষ থেকে
সপ্তম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়

সপ্তম শ্রেণি

রচনায়

অধ্যাপক মমতাজউদ্দীন পাটোয়ারী
অধ্যাপক ড. খোন্দকার মোকাদ্দেম হোসেন
অধ্যাপক ড. আবু মোঃ দেলোয়ার হোসেন
অধ্যাপক ড. এ কে এম শাহনাওয়াজ
ড. সেলিনা আক্তার
ফাহ্‌মিদা হক
ড. উত্তম কুমার দাশ
আনোয়ারুল হক
সৈয়দা সঙ্গীতা ইমাম

সম্পাদনা

অধ্যাপক ড. মুনতাসীর মামুন
অধ্যাপক শফিউল আলম
আবুল মোমেন
অধ্যাপক ড. মাহবুব সাদিক
অধ্যাপক ড. মোরশেদ শফিউল হাসান
অধ্যাপক ড. সৈয়দ আজিজুল হক
সৈয়দ মাহফুজ আলী

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড
৬৯-৭০, মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা
কর্তৃক প্রকাশিত।

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর, ২০১১
পরিমার্জিত সংস্করণ : জুন, ২০১৪
পুনর্মুদ্রণ : , ২০১৫

পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নে সমন্বয়ক
দিলরুবা আহমেদ
পারভেজ আক্তার
তাহমিনা রহমান

প্রচ্ছদ ও চিত্রাঙ্কন
সুদর্শন বাছার
সুজাউল আবেদীন

ডিজাইন
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

কম্পিউটার কম্পোজ
বর্ণণস কালার স্ক্যান

সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণে :

প্রসঙ্গ-কথা

শিক্ষা জাতীয় উন্নয়নের পূর্বশর্ত। আধুনিক ও যুগোপযোগী শিক্ষা ছাড়া আত্মনির্ভরশীল, দক্ষ ও মর্যাদাসম্পন্ন জাতি-গঠন সম্ভব নয়। এই প্রত্যয় ও প্রণোদনা থেকেই জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০ প্রণীত হয়। উক্ত শিক্ষানীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সামনে রেখে নতুন এক জীবনাকাঙ্ক্ষা ও জীবন বাস্তবতার পটভূমিতে রচিত হয় নিম্নমাধ্যমিক ও মাধ্যমিক স্তরের নতুন শিক্ষাক্রম। ২০১২ সালে প্রণীত এই শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্যকে যথাযথভাবে সপ্তম শ্রেণির **বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়** শীর্ষক পাঠ্যপুস্তকটিতে প্রতিফলিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। নতুন শিক্ষাক্রমের আলোকে রচিত এই পাঠ্যপুস্তকটির বিষয়বস্তু নতুন আঙ্গিক ও কৌশলে উপস্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে। বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয় পাঠ্যপুস্তকটি প্রণয়নে সমাজ, ইতিহাস, পৌরনীতি, অর্থনীতি, ভূগোল ও জনসংখ্যার বিষয়গুলো স্বতন্ত্রভাবে উপস্থাপনের পরিবর্তে সমন্বিতভাবে প্রণয়ন করা হয়েছে। এতে শিক্ষার্থী কোনো একটি নির্দিষ্ট সময়ের সার্বিক অবস্থা অর্থাৎ ঐ সময়ের বাংলাদেশ ও বিশ্ব প্রেক্ষিত সম্পর্কে সম্যক ধারনা লাভ করবে। এর ফলে শিক্ষার্থীরা এদেশের ইতিহাস-ঐতিহ্য, শিল্প-সংস্কৃতি, নীতি-নৈতিকতা ও মূল্যবোধ সম্পর্কে ধারণা লাভ করবে এবং এই জনগোষ্ঠীর জীবনযাপন, মুক্তিযুদ্ধের মহান অর্জন, দেশপ্রেম, মানবতাবোধ, ভ্রাতৃত্ববোধ ও বিজ্ঞান-চেতনা ইত্যাকার অতীব তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় নিয়ে ভাববার সুযোগ পাবে। সুস্থ চিন্তার চর্চা ও পরিচ্ছন্ন জীবনবোধ সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের আগ্রহী করে তোলাই এই আয়োজনের অন্যতম উদ্দেশ্য। এছাড়া জাতীয় প্রত্যাশা অনুযায়ী প্রচুর পাঠের ভার থেকে শিক্ষার্থীদের মুক্ত করে স্বল্প ও সুন্দর আয়োজনের মধ্যে তাদের আনন্দিত বিচরণ নিশ্চিত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

নতুন শিক্ষাক্রমের আলোকে মূল্যায়নকে আরও ফলপ্রসূ করার জন্য দেশের সুধীজন ও শিক্ষাবিদগণের পরামর্শের প্রেক্ষিতে ও সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রতিটি অধ্যায়শেষে অনুশীলনের জন্য নমুনা হিসেবে বহুনির্বাচনি ও সৃজনশীল প্রশ্ন সংযোজন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মুখস্থনির্ভরতা বহুলাংশে হ্রাস পাবে এবং তারা অর্জিত জ্ঞান ও অনুধাবন বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করতে এবং যেকোনো বিষয়কে বিচার-বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন করতে পারবে। এছাড়া প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে বাস্তব জীবনোপযোগী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সম্পৃক্ত করার জন্য বিচিত্র কাজের আয়োজন রাখা হয়েছে। 'অনুশীলনমূলক কাজ' নামে অনুশীলনের এই অংশে শিক্ষার্থীরা ব্যক্তিগত দক্ষতা, সৃজনশীলতা, রুচি ও সৌন্দর্যবোধের পরিচয় দিতে পারবে। গ্রন্থটিতে বানানের ক্ষেত্রে সর্বত্র অনুসৃত হয়েছে বাংলা একাডেমী কর্তৃক প্রণীত বানানরীতি।

একবিংশ শতকের অঙ্গীকার ও প্রত্যয়কে সামনে রেখে পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আলোকে পাঠ্যপুস্তকটি রচিত হয়েছে। শিক্ষাক্রম উন্নয়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া এবং এর ভিত্তিতে পাঠ্যপুস্তক রচিত হয়। সম্প্রতি যৌক্তিক মূল্যায়ন ও ট্রাই আউট কার্যক্রমের মাধ্যমে সংশোধন ও পরিমার্জন করে বইটিকে ত্রুটিমুক্ত করা হয়েছে — যার প্রতিফলন বইটির বর্তমান সংস্করণে পাওয়া যাবে।

পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, সৃজনশীল প্রশ্ন ও অনুশীলনমূলক কাজ প্রণয়ন,পরিমার্জন ও প্রকাশনার কাজে আন্তরিকভাবে যাঁরা মেধা ও শ্রম দিয়েছেন, তাঁদের জানাই ধন্যবাদ। পাঠ্যপুস্তকটি শিক্ষার্থীদের আনন্দিত পাঠ ও প্রত্যাশিত দক্ষতা অর্জন নিশ্চিত করবে বলে আশা করি।

প্রফেসর নারায়ন চন্দ্র পাল
চেয়ারম্যান
জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা।

সূচিপত্র

অধ্যায়	অধ্যায়ের শিরোনাম	পাঠ	পাঠ শিরোনাম	পৃষ্ঠা
এক	বাঙালির	১	কৈবর্ত বিদ্রোহ	১
	স্বাধীনতার সংগ্রাম	২	ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ	২
		৩	নীল প্রতিরোধ আন্দোলন ও তিতুমীরের বিদ্রোহ	৩
		৪	সাঁওতাল বিদ্রোহ	৪
দুই	বাংলাদেশের	১	পাকিস্তানের সংকট	৭
	স্বাধীনতার	২	রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন	৮
	পটভূমি	৩	যুক্তফ্রন্ট	১০
		৪	গণআন্দোলন থেকে গণঅভ্যুত্থান	১২
		৫	ঐতিহাসিক আগরতলা মামলা (রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান)	১৪
		৬	১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন	১৬
		৭ ও ৮	পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের বৈষম্য	১৮
তিন	বাংলাদেশের	১	সংস্কৃতিতে প্রকৃতির ভূমিকা	২৩
	সাংস্কৃতিক	২	সংস্কৃতিতে জীবিকার ভূমিকা	২৫
	বৈচিত্র্য	৩	সংস্কৃতিতে ধর্মের ভূমিকা	২৫
		৪	উৎসব ও মেলা	২৬
চার	বাংলাদেশের অর্থনীতি	১ ও ২	বাংলাদেশের অর্থনীতি	৩০
		৩ ও ৪	বাংলাদেশের অর্থনীতিতে শিল্পের ভূমিকা	৩২
		৫	বাংলাদেশের আমদানি ও রপ্তানি	৩৫
পাঁচ	বাংলাদেশের	১	নির্বাচনের গুরুত্ব ও নির্বাচন পদ্ধতি	৩৯
	নির্বাচন ব্যবস্থা	২ ও ৩	বাংলাদেশের জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের নির্বাচন	৪০
ছয়	বাংলাদেশের	১	বাংলাদেশের জলবায়ুর প্রকৃতি	৪৫
	জলবায়ু	২	বাংলাদেশের জলবায়ু পরিবর্তনের কারণ	৪৬
		৩, ৪ ও ৫	জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট দুর্যোগ	৪৮
সাত	বাংলাদেশর জনসংখ্যা	১ ও ২	বাংলাদেশের জনসংখ্যা	৫৫
	পরিচিতি	৩	জনসংখ্যা বৃদ্ধিজনিত সমস্যা	৫৭
আট	বাংলাদেশে নারী	১	সমাজে নারীর ভূমিকা	৬১
	অধিকার	২	বাংলাদেশে নারীর অধিকার	৬২
নয়	বাংলাদেশে প্রবীণ ব্যক্তির	১	সমাজে প্রবীণদের অবস্থান	৬৪
	অধিকার	২	প্রবীণদের সমস্যা	৬৫
দশ	বাংলাদেশের	১	বাংলাদেশে যৌতুক প্রথা	৬৮
	সামাজিক সমস্যা	২	যৌতুক নিরোধ আইন	৬৯
এগার	এশিয়ার কয়েকটি	১	বাংলাদেশের সঙ্গে বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার সম্পর্ক	৭২
	দেশ	২	বাংলাদেশের সঙ্গে বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার সম্পর্ক	৭৪
বার	আঞ্চলিক সংস্থা	১ ও ২	এশিয়ার কয়েকটি আঞ্চলিক সংস্থা	৭৯

অধ্যায়-এক

বাঙালির স্বাধীনতার সংগ্রাম

সুজলা-সুফলা উর্বর বাংলাদেশ চিরকাল বাইরের মানুষকে আকৃষ্ট করেছে। কালে কালে নানা জাতের সাধারণ মানুষ ছাড়াও দূর-দূরান্ত থেকে অনেক উচ্চাভিলাষী মানুষও এদেশে এসেছে। তারা অনেকে বসতি করেছে, অনেকে রাজ্য স্থাপন করেছে। তবে সমাজের সাধারণ মানুষ উপর-মহলের এসব ক্ষমতার হাত-বদল নিয়ে তেমন মাথা ঘামায় নি। আসলে সেকালে রাজা-বাদশাহরাও সমাজ নিয়ে মাথা ঘামাত না। আবার সাধারণ মানুষের জীবন চলত সমাজের নিয়মে ও নিয়ন্ত্রণে। ফলে রাজার সাথে সাধারণ মানুষের দ্বন্দ্বের খুব একটা সুযোগ হতো না। ঐতিহাসিক কোসাম্বির মতে, ভারতবর্ষে গ্রামগুলো ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ আর গ্রামের সমাজই মানুষের জীবনযাপনকে নিয়ন্ত্রণ করত। রবীন্দ্রনাথের মতে, প্রাচীন রোম বা পারস্যের মতো শক্তিশালী কেন্দ্রশাসিত সাম্রাজ্য ভারতবর্ষে ছিল না, এখানে সমাজই ছিল শক্তিশালী।

কিন্তু এ সত্ত্বেও যখনই সমাজের উপর রাষ্ট্রশক্তির জোরজুলুম চলেছে তখনই সমাজ থেকে প্রতিবাদ উঠেছে। সহজ সরল দরিদ্র গ্রামীণ মানুষ তখন কেবল প্রতিবাদ করে ক্ষান্ত হয় নি, প্রতিরোধেও উদ্যোগী হয়েছে। এমনকি বিদ্রোহ করতে কুণ্ঠিত হয় নি। ইতিহাস থেকে তেমন কয়েকটি বড় ধরনের বিদ্রোহ ও সংগ্রামের কথা এখানে তুলে ধরা হলো।

পাঠ-১ : কৈবর্ত বিদ্রোহ

এদেশের মানুষের বিদ্রোহের চেতনা বেশ পুরোনো। তবে সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণের মাধ্যমে বাংলায় প্রথম সফল বিদ্রোহ হয় পাল আমলে। রাজা দ্বিতীয় মহীপালের শাসনকালে (১০৭০-১০৭৭ খ্রিষ্টাব্দ) কৈবর্ত বিদ্রোহ হয়। অনেকে শুধু জেলে সম্প্রদায়কে কৈবর্ত বললেও প্রকৃত পক্ষে জেলে, কৃষক ও শ্রমজীবি মানুষকে সাধারণত কৈবর্ত বলা হতো। পাল রাজাদের চারশত বছরের শাসন শুরু হয়েছিল ৭৫০ সালের দিকে। সফল রাজা ছিলেন ধর্মপাল ও দেবপাল। সে স্বর্ণযুগ পেরিয়ে দ্বিতীয় মহীপালের সময় রাজ্যে কিছু বিশৃঙ্খলা ছিল। শাসনকাজেও দক্ষতার ঘাটতি হচ্ছিল। তাতে মানুষের মনে ক্ষোভ ও হতাশা তৈরি হয়েছিল।

পাল রাজাদের একজন সামন্ত দিব্যর নেতৃত্বে বিদ্রোহ করে কৈবর্তরা রাজ্যের বরেন্দ্রী অংশ দখল করে নেয়। কৈবর্ত্য বিদ্রোহকে অনেক সময় বরেন্দ্র বিদ্রোহ বা সামন্ত বিদ্রোহও বলা হয়ে থাকে। রাজা দ্বিতীয় মহীপাল কৈবর্তবাহিনীকে আক্রমণ করতে গিয়ে নিজে নিহত হন। ফলে কিছুকালের জন্যে বরেন্দ্রীতে কৈবর্তদের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। দিব্যের পর তাঁর ভাই রুদোক এবং তারপরে রুদোকের পুত্র ভীম রাজা হন। ভীম দক্ষ শাসক হিসেবে যুদ্ধ বিধ্বস্ত বরেন্দ্রীর শ্রী ও সমৃদ্ধি অনেকটাই ফিরিয়ে এনেছিলেন।

অবশেষে রামপাল সিংহাসনে বসে পিতৃভূমি বরেন্দ্রী উদ্ধারে সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। তিনি প্রতিবেশী বিভিন্ন সামন্তরাজাদের সহযোগিতায় ভীমকে পরাজিত করে বিদ্রোহী কৈবর্তরাজ্যের অবসান ঘটান। এভাবে বিদ্রোহী বাঙালির প্রথম সফল রাষ্ট্রবিপ্লবের সমাপ্তি ঘটে।

অনুশীলনমূলক কাজ

কাজ-১ : সেকালের ভারতবর্ষে সাধারণ মানুষের জীবন চলত কীভাবে?

কাজ-২ : কৈবর্ত কারা? কোন রাজার আমলে কৈবর্ত বিদ্রোহ হয়?

পাঠ-২: ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ

কৃষির উপর আমাদের অর্থনীতি নির্ভরশীল। অতীতে কৃষকরা শাসক ও ভূ-স্বামী দ্বারা নির্যাতিত হতো। মোঘল আমলে সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময় থেকে নিপীড়নের মাত্রা বেড়ে যেতে থাকে। আর তখন থেকে ইংরেজ আমল পর্যন্ত অসংখ্য কৃষক বিদ্রোহ হয়েছে এদেশে। কৃষকদের উপর অত্যাচারের মাত্রা বুঝতে অষ্টাদশ শতকের কবি ঘনরামের রচিত ধর্মমঙ্গল কাব্য থেকে শোনা যাক--

অবিচারে ভাঙ্গো রাজ্যে গৌড়ের ভুবন
পীড়া পেয়ে পাত্রের পলায় প্রজাগণ ॥
রাজকর লোকের তেমনি নিলো বাড়া।
অতএব সকল প্রজা হলো দেশছাড়া ॥

আর ইতালীয় পর্যটক মানুচ্চি কৃষকদের উপর নিষ্ঠুরতার বর্ণনা দিয়েছেন এভাবে--তাদের গাছের সঙ্গে বাঁধা হতো এবং ঘুষি ও কোড়া মারা হতো। এক ইঞ্চি পুরু ও ছয় ফুট (১ ফ্যাদম) লম্বা ষাঁড়ের লেজের মতো পাকানো দড়ির নাম কোড়া। এটা দিয়ে তারা পাঁজর ও হাড়ের বিভিন্ন অংশে ও সারা শরীরে সর্বশক্তি দিয়ে মারত। শরীরের বিভিন্ন জায়গায় এক ইঞ্চি গভীর দাগ বসে যেত ও চামড়া ফেটে যেত।

ইতিহাসবিদ সুপ্রকাশ রায় বলেছেন, এ সময়ে বাংলায় ছোটবড় অসংখ্য কৃষক বিদ্রোহ হয়েছিল। এর মধ্যে প্রধান হলো-ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ।

ইংরেজ আমলের গোড়ার দিকে ১৭৬৩ থেকে ১৮০০ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ৩৭ বছর ধরে উত্তর ও পশ্চিমবঙ্গ এবং বিহারের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে সংঘটিত হয়েছে এ বিদ্রোহ। এ বিদ্রোহের নেতৃবৃন্দের মধ্যে মজনু শাহ, মুসা শাহ, চেরাগ আলী, ভবানী পাঠক, নূর আলদীন, পীতাম্বর প্রমুখ ইতিহাসে শ্রদ্ধার সাথে উল্লিখিত হন। এই বিদ্রোহে গ্রামের কৃষক এবং জোলা ছাড়াও কামার, কুমারসহ কারিগর শ্রেণিও অংশ নেয়। এ বিদ্রোহ ব্যাপক অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ার আরেকটি কারণ হলো ১৭৭০ সালে (১১৭৬ বঙ্গাব্দ) সংঘটিত দুর্ভিক্ষ। এই দুর্ভিক্ষ ইতিহাসে বাংলা সন অনুযায়ী ছিয়াত্তরের মন্বন্তর নামে পরিচিত। দেশীয় সামন্তপ্রভু আর বিদেশি বণিকদের শোষণ ছাড়াও তখন চলছিল অনাবৃষ্টিজনিত সমস্যা। দুয়ে মিলে এই দুর্ভিক্ষ। এই মন্বন্তরে প্রায় এক কোটি লোক মারা যায়। তখন দেশের লোক সংখ্যা ছিল প্রায় তিন কোটি। তার মানে দেশের তিন ভাগের এক ভাগ মানুষই মারা গিয়েছিল। তাতেও কিন্তু ইংরেজ শাসক আর তাদের দেশীয় দোসরদের শোষণ ও অত্যাচারের মাত্রা কমেনি। এরকম অন্যায় চোখের সামনে দেখে সহ্য করা ছিল মুশকিল। তাই এ বিদ্রোহ যেমন ছড়িয়ে পড়েছিল বিস্তীর্ণ অঞ্চলে তেমনি স্থায়ী হয়েছিল দীর্ঘদিন। এ বিদ্রোহের লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে হিন্দু-মুসলমানের

ঐক্যবদ্ধ অংশগ্রহণ। নেতাদের মধ্যে যেমন হিন্দু ও মুসলমানের সমাবেশ ঘটেছে তেমনি অনুসারী বিদ্রোহীদের মধ্যেও উভয় সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণ ছিল। এটা ঘটেছে পরিস্থিতির প্রয়োজনে স্বতঃস্ফূর্তভাবে। তারা অসংখ্যবার ইংরেজ সৈন্যদের রুখে দিয়েছে, পরাস্ত করেছে। বিদ্রোহের নেতৃবৃন্দের ত্যাগী জীবন, মানবিক আচরণ, প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতা মিলে সাধারণ মানুষের কাছে তাঁরা ফকির ও সন্ন্যাসী হিসেবেই শ্রদ্ধার আসনে বসেছিলেন। এভাবেই এটি ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ হিসেবে ইতিহাসে পরিচিতি পেয়েছে।

অনুশীলনমূলক কাজ

কাজ-১ : সেকালে আমাদের অর্থনীতি কিসের উপর নির্ভরশীল ছিল? কৃষকদের উপর কেন বেশি অত্যাচার হতো?

কাজ-২ : ইংরেজ আমলের গোড়ার দিকে দীর্ঘদিন ধরে কোন কোন অঞ্চল জুড়ে কেন বিদ্রোহ হয়েছিল?

কাজ-৩ : কোন বিদ্রোহকে ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহ বলা হয়?

কাজ-৪ : ফকির-সন্ন্যাসী বিদ্রোহের নেতৃত্বদানকারী কয়েকজন বিদ্রোহী নেতার নামের তালিকা প্রস্তুত কর।

পাঠ-৩ : নীল প্রতিরোধ আন্দোলন ও তিতুমীরের বিদ্রোহ

বাংলা থেকে লুট করা সম্পদ দিয়ে ইংরেজরা নিজ দেশে শুরু করে শিল্পকারখানা বানানোর কাজ। এভাবেই শুরু হয় পশ্চিমা বিশ্বের শিল্প বিপ্লব। উৎপাদন ব্যবস্থা ও বিশ্ব অর্থনীতিতে এর প্রভাব হয়েছে সুদূরপ্রসারী। বাষ্পীয় ইঞ্জিন, কলের তাঁত ইত্যাদি আবিষ্কার তাতে সাহায্য করে। প্রথম দিকে প্রসারিত হয় কলের তাঁত বা বস্ত্রশিল্প। আর এসময় অধিকাংশ কাপড়ই হতো সাদা। কাপড় সাদা করা ও সাদা রাখার কাজে খুবই কার্যকর ছিল নীল, যা গাছ থেকে পাওয়া যেত। এসব গাছ খুব সহজে আমাদের দেশে জন্মাত।

ইংরেজদের দেশে যতই কলের তাঁত বেড়েছে ততই বেড়েছে নীলের চাহিদা। তারা নীলচাষের জন্য বাংলার কৃষকদের বাধ্য করতে লাগল। ফসলি জমিতে নীলচাষ করলে কৃষকের ক্ষতি। ইংরেজ যে দাম দেয় তাতে উৎপাদন খরচ উঠে না। তাছাড়া ধানচালের উৎপাদন কমে গেলে খাওয়ার সংকট বেড়ে যায়। ফলে চাষিরা সহজে নীল চাষ করতে চাইত না। আর তাই বাংলার কৃষকদের নীলচাষে বাধ্য করার জন্যে ইংরেজরা অত্যাচারের পথ ধরেছিল। কিছুকাল আগেও নীলকুঠি ও নীলসাহেবদের কথা শুনলে বাংলার কৃষক আতঙ্কিত হতো।

১৮১৫-১৬ সালে বাংলায় ১,২৮,০০০ মণ নীল তৈরি হয়েছিল। তখন থেকে বাংলা একা সারা পৃথিবীর নীলের চাহিদা মিটিয়েছে। এর জন্যে অকথ্য অত্যাচার সইতে হয়েছে বাংলার নীলচাষিকে। সেকালের বিখ্যাত কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত লিখেছেন--নীলকরের কী অত্যাচার/এই নীলে সকল নিলে এদের নিলে (লীলা) বোঝা ভার। আর দীনবন্ধু মিত্র লিখেছেন নাটক-নীলদর্পণ। তাতে নীলচাষিদের উপর অত্যাচারের মর্মস্পর্শী চিত্র ফুটে উঠেছে।

নীল প্রতিরোধ আন্দোলনের প্রথম প্রবাদপুরুষ হলেন সর্দার বিশ্বনাথ। সেকালে আমাদের জাতীয় চেতনার অভাবে দুর্ভাগ্যক্রমে বিশে ডাকাত নামে পরিচিত হয়েছিলেন তিনি। বিশ্বনাথ অনেক সফল বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের নায়ক। ১৮০৮ সালে বার জন সঙ্গীসহ ইংরেজদের হাতে ধরা পড়ে তাঁরা সকলে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন।

তাতে অবশ্য নীলপ্রতিরোধ আন্দোলন থামে নি। ধর্মসংস্কারমূলক ওয়াহাবি আন্দোলনের সূত্র ধরে ১৮৩১ সাল নাগাদ তিতুমীরের নেতৃত্বে চব্বিশ পরগণা এলাকায় বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠে। দরিদ্র ও নিঃস্ব মানুষ তাঁর ডাকে সাড়া দেয়। তিতুমীরের নেতৃত্বে এক পর্যায়ে চব্বিশ পরগণা, নদীয়া, ফরিদপুর নিয়ে এক বিরাট ভূখণ্ড মুক্তাঞ্চলে পরিণত হয়। এক পর্যায়ে ইংরেজ নীলকর ও তাদের দোসর জমিদার ছাড়াও তাঁর নেতৃত্বে সাধারণ মানুষ ইংরেজ শাসনকেই চ্যালেঞ্জ জানায়। অবশেষে ১৮৩১ সালের ১৯শে নভেম্বর ইতিহাসখ্যাত বাঁশের কেল্লার লড়াইয়ে শহিদ হলেন বীর তিতুমীর ও তাঁর পঞ্চাশজন সহযোদ্ধা। আর বন্দী হয়ে পরে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন অনেকেই।

তিতুমীর

অনুশীলনমূলক কাজ

কাজ-১ : নীলচাষের জন্য ইংরেজরা কেন এত জোরজুলুম চালাত?

কাজ-২ : নীলকরদের অত্যাচারের ধরন কী রকম ছিল--দুয়েকটি উদাহরণ দাও।

কাজ-৩ : নীল বিদ্রোহের প্রথম প্রবাদপুরুষ কে?

কাজ-৪ : বিদ্রোহী নেতা তিতুমীরের পরিচয় দাও।

পাঠ-৪ : সাঁওতাল বিদ্রোহ

উত্তরবঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের কিছু অঞ্চলে বসতি আছে সাঁওতাল জাতির। এ অঞ্চলকে এক সময় সাঁওতাল পরগণা বলা হতো। সাঁওতালরা ছিল খুবই দরিদ্র। মূলত চাষের কাজে খাটানোর জন্য পশ্চিম ভারত থেকে এই সাঁওতালদের নিয়ে এসেছিল জমিদাররা। তাই আসলে অরণ্য প্রকৃতির কোলে অভ্যস্ত হলেও সাঁওতাল পরগণায় তাদের স্থানীয় জমিদারদের জমিতে বেগার খাটতে হতো। মজুরি পেত সামান্য। ইংরেজ শাসনকালে জমিদারদের অত্যাচার বেড়ে গেলে এক সময় ১৮৫৫ সালের দিকে তারা প্রতিবাদী হয়ে উঠে। নেতা তাদের দুই ভাই--সিধু আর কানু। সে বছর ৩০শে জুন সভা করে প্রায় দশ হাজার সাঁওতাল বিদ্রোহ শুরু করে। জমিদারদের পাশে এসে দাঁড়ায় ইংরেজ সৈন্য ও তাদের পুলিশ। ফলে অচিরেই বিদ্রোহীদের মুখোমুখি হতে হয় ইংরেজ সৈন্য ও সরকারের। বিদ্রোহীরা বিষাক্ত তীর আর ধনুক দিয়ে যুদ্ধ করে বারবার উন্নত অস্ত্রসজ্জিত ইংরেজ বাহিনীকে পরাজিত করে। সাঁওতালদের ঐক্য ও সাফল্য দেখে প্রতিবেশী হিন্দু-মুসলিম সাধারণ বাঙালিরাও তাদের পাশে এসে দাঁড়ায়। কখনও কামাররা অস্ত্র বানিয়ে দিয়েছে, কখনও কামার, কুমার, কৃষকরা, সাঁওতালদের পাশে

দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করেছে। ইংরেজ সেনাপতি মেজর বারোজের নেতৃত্বে বিরাট বাহিনী কামান বন্দুক নিয়ে আক্রমণ করে সাঁওতাল বাহিনীকে। সিধু ও কানুর নেতৃত্বে সেদিন ইংরেজ বাহিনীকে পরাজিত ও ধ্বংস করে সাঁওতালরা বিজয়ী হয়েছিল। বিজয়ের এ দিনটি ছিল ১৮৫৫ সালের ১৬ই জুলাই।

পরাজিত ইংরেজ ভীত হয়ে বড়লাট লর্ড ডালহৌসির (১৮৪৮-১৮৫৬) নির্দেশে আরও বড় সৈন্যবহর নিয়ে বিদ্রোহীদের দমাতে আসে। কিন্তু সাঁওতাল নেতা সিধু, কানু, ভৈরব ও চাঁদের নেতৃত্বে যে প্রতিরোধ হয় তাতে ইংরেজ বাহিনী অনেক ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। বারবার এভাবে পরাস্ত হয়ে শেষে ইংরেজরা বিশাল বাহিনী তৈরি করে সাঁওতাল বিদ্রোহের গ্রামগুলোতে নির্মম আক্রমণ চালায়। এক জমিদারের পঞ্চাশটি হাতিকে উত্তেজিত করে গ্রামে গ্রামে তাণ্ডব চালানোর জন্যে ছেড়ে দেওয়া হয়। গ্রামের বাড়িঘরে আগুন দেওয়া হয়। আত্মরক্ষায় ব্যস্ত শিশু ও মহিলাদের নির্বিচারে গুলি করে হত্যা করা হয়। এভাবে কাপুরুষের মতো নিরীহ নারী-পুরুষ হত্যা ও গণহারে ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে তারা এই বিদ্রোহ ধীরে ধীরে প্রশমিত করতে সক্ষম হয়। এই বিদ্রোহের নেতারাও স্বাধীনতা সংগ্রামের মহান শহিদ।

এরকম অসংখ্য বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছে বাংলায়। ১৮৫৭ সালের ঐতিহাসিক সিপাহি বিদ্রোহ ছিল ইংরেজদের বিরুদ্ধে সারা ভারতের স্বাধীনতার জন্য প্রথম বিদ্রোহ, তারও সূচনা হয়েছিল কিন্তু বাংলায়।

অনুশীলনমূলক কাজ

কাজ- ১ : চার দলে বিভক্ত হয়ে প্রতি দলে একটি করে বিদ্রোহ সম্পর্কে সচিত্র দেওয়াল পত্রিকা তৈরি কর।

কাজ- ২ : বিদ্রোহের নেতাদের সম্পর্কে তথ্য ও ছবি দিয়ে ক্লাসে সেমিনার কর। পরে সেমিনারের সারসংক্ষেপ লেখ।

কাজ- ৩ : সাঁওতাল বিদ্রোহের বর্ণনা দাও।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কৈবর্ত বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন কে?

ক. দিব্য খ. রুদোক
গ. ভীম ঘ. রাম

২. ফকির-সন্ন্যাসীদের অসংখ্যবার ইংরেজদের আক্রমণ রুখে দেয়ার কারণ–

i. হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য
ii. বিদ্রোহী নেতৃবৃন্দের দূরদর্শিতা
iii. ফকির সন্ন্যাসীদের আধ্যাত্মিক শক্তি

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

আব্দুর রাজ্জাক মিঠাপুর গ্রামের একটি ঐতিহ্যবাহী ঘটনা শুনে খুব বিস্মিত হন। মধ্যযুগে ঐ গ্রামে খরার কারণে ফসল না হওয়ায় দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। ওই সময় জমিদাররা প্রজাদের কোনো সাহায্য না করলে কয়েকজন নেতৃস্থানীয় লোক মিলে এর প্রতিবাদ করে এবং জমিদার বাহিনীকে পরাস্ত করে।

৩. উদ্দীপকের ঘটনা কোন বিদ্রোহের ক্ষেত্র তৈরির ঘটনাকে ইঙ্গিত করে?

ক. নীল বিদ্রোহ খ. ফকির সন্ন্যাসী বিদ্রোহ
গ. কৈবর্ত বিদ্রোহ ঘ. সাঁওতাল বিদ্রোহ

৪. ইঙ্গিতকারী বিদ্রোহের বিশেষ দিক ছিল নিচের কোনটি?

ক. বিদেশি শাসক ও শোষণকারীদের দমন
খ. দরিদ্র ও অসহায় মানুষের আত্মত্যাগ
গ. শাসকদের অসহযোগিতার মাধ্যমে দমন
ঘ. সকল ধর্মীয় নেতাদের মহান আত্মত্যাগ

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. ফুলপুর অঞ্চলের অসাধু ব্যবসায়ীরা নিজেদের স্বার্থে চাষিদের দিয়ে জোর করে তামাক চাষ করাচ্ছে। এতে ধানের উৎপাদন কমে যাওয়ায় উক্ত অঞ্চলের লোকজনের খাদ্য সংকট দেখা দেয়। তবুও ব্যবসায়ীদের চাপে চাষিরা তামাক চাষে বাধ্য হয়। ফলে চাষিরা বিদ্রোহী হয়ে উঠে। চাষিদের এ অত্যাচার থেকে বাঁচানোর জন্য নিজাম সাহেব দরিদ্র নিঃস্ব মানুষদেরকে একত্রিত করেন এবং তাদের নিয়ে একটি স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন করেন।

ক. সেকালে আমাদের অর্থনীতি কিসের উপর নির্ভরশীল ছিল ?
খ. ইংল্যান্ডে শিল্পবিপ্লব কীভাবে শুরু হয়েছিল ? ব্যাখ্যা কর।
গ. ফুলপুর অঞ্চলের কৃষকদের বিদ্রোহে তোমার পাঠ্যবইয়ের কোন বিদ্রোহের বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে বর্ণনা কর।
ঘ. নিজাম সাহেব ও তিতুমীরের কর্মকাণ্ডের তুলনামূলক বিশ্লেষণ কর।

২. সখিপুর গ্রামের কৃষক সম্প্রদায়ের লোকজন মহাজনদের দ্বারা খুব অত্যাচারিত হতো। তাদেরকে অল্প মজুরিতে সারাদিন খাটাত। এ অবস্থায় বিজন ও বিপ্লব নামে দুই ব্যক্তি তাদেরকে সংঘটিত করে। তাদের নেতৃত্বে অত্যাচারিত শ্রেণি ঐক্যবদ্ধ হয়। সাধারণ জনগণও তাদের সমর্থন জানায়। মহাজনদের জনবল ও অস্ত্রশস্ত্র তাদেরকে দমাতে পারেনি।

ক. কৈবর্ত কাদের বলা হতো?
খ. ইংরেজ আমলে অসংখ্য বার কৃষক বিদ্রোহ হয়েছিল কেন ? ব্যাখ্যা কর।
গ. উদ্দীপকে মহাজনদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ কাদের বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে?– ব্যাখ্যা কর।
ঘ. উদ্দীপকে অত্যাচারিত শ্রেণির মনোভাবই সাঁওতাল বিদ্রোহের সাফল্যের পেছনে মূল কারণ ছিল– বক্তব্যটি মূল্যায়ন কর।

অধ্যায়-দুই
বাংলাদেশের স্বাধীনতার পটভূমি

স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম বাঙালির জাতীয় জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। বাঙালিরা পাকিস্তান রাষ্ট্রের শোষণ, অত্যাচার ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে ধারাবাহিকভাবে সংগ্রাম ও আন্দোলন চালিয়ে এসেছিল। এর মধ্যে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিজয়, সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলন, ১৯৬২ ও ১৯৬৪ সালের ছাত্র আন্দোলন অন্যতম। এছাড়া ১৯৬৬ সালের ৬ দফা আন্দোলন, ঐতিহাসিক আগরতলা মামলা, সাংস্কৃতিক স্বাধিকার আন্দোলন, ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান এবং ১৯৭০ সালের নির্বাচন বাঙালির জাতীয় জাগরণের ক্ষেত্রে ব্যাপক ভূমিকা রাখে। এসব আন্দোলন ও ঘটনার মধ্য দিয়েই পাকিস্তান বিরোধী চেতনা বেগবান হয়েছে, বাঙালি জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ হয়েছে মানুষ। এর ফলেই সম্ভব হয়েছে ১৯৭১ সালের মহান মুক্তিযুদ্ধের মতো রক্তক্ষয়ী সশস্ত্র যুদ্ধে ব্যাপক জনগণের অংশগ্রহণ এবং দেশ ও জাতির সার্বিক মুক্তি অর্জন। আমাদের জাতীয় ইতিহাসে ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ সাল পর্যন্ত পাকিস্তান পর্বটির ঘটনাপ্রবাহ সুদূরপ্রসারী। এই সময়ে পাকিস্তানের আদর্শিক সংকট পরিষ্কার হয়ে যায়। সে সম্পর্কে এবং পাকিস্তানের বিরুদ্ধে পরিচালিত আন্দোলন ও সংগ্রামের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় এখানে তুলে ধরা হলো।

পাঠ-১ : পাকিস্তানের সংকট

বহু আকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা লাভের পর পাকিস্তানের স্থাপিত মোহাম্মদ আলী জিন্নাহসহ দেশটির নেতৃবৃন্দের মধ্যে রাষ্ট্রের নীতি, আদর্শ নিয়ে বিভ্রান্তি দেখা দেয়। এ অবস্থাকে বলা যায় পরিচয়ের সংকট। হিন্দু ও মুসলিম দুই পৃথক জাতি, এই দাবি ছিল পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পক্ষে তাদের প্রধান যুক্তি। কিন্তু স্বাধীনতার পরে নেতৃবৃন্দ বুঝতে পারলেন ধর্ম ছাড়াও মানুষের আরও পরিচয় আছে। ভাষা এর মধ্যে অন্যতম। পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে পূর্ব বাংলায় অধিকাংশ মানুষ বাংলাভাষী হলেও পশ্চিম অংশে অন্তত চারটি ভিন্ন ভাষাভাষী মানুষ বাস করে। উর্দুভাষার মাধ্যমে তাদের ঐক্যবদ্ধ করা সম্ভব হলেও আঞ্চলিক ও লোকসংস্কৃতির পার্থক্য ঘুচানোর উপায় ছিল না। ফলে মুসলিম জাতীয়তাবাদের প্রধান প্রবক্তা জিন্নাহ নিজে স্বাধীনতার কয়েকদিন পরেই গণপরিষদে বললেন, মুসলিম-হিন্দু-খ্রিষ্টান-বৌদ্ধ কিংবা পাঞ্জাবি-বাঙালি-সিন্ধি-পাখতুন পরিচয় ভুলে সকলকেই এখন এক পাকিস্তানি হতে হবে। কিন্তু সেই পাকিস্তানের ঐক্যসূত্র তৈরি করতে গিয়ে তারা ইসলাম ও উর্দুভাষার উপর জোর দেয় আর অন্যান্য ধর্ম ও অন্যান্য ভাষা-সংস্কৃতির বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়। এমনকি বাংলাভাষার সমৃদ্ধ সাহিত্য, রবীন্দ্রনাথ-মাইকেল-বঙ্কিমের মতো গুরুত্বপূর্ণ সাহিত্যিকদের প্রতি বৈরি অবস্থান গ্রহণ করে। এতে দেশে ঐক্যের পরিবর্তে বিভ্রান্তি ছড়ায় ও দেশবাসীর মধ্যে দেখা দেয় বিভাজন।

যে বাঙালি মুসলমান পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার জন্যে সর্বাত্মক সংগ্রাম করেছিল, নতুন দেশটি নিয়ে তাদের স্বপ্নভঙ্গ হলো সবার আগে। পূর্ব বাংলার বিদগ্ধজন পাকিস্তান সরকারের এ ধরনের পদক্ষেপে বাঙালির সর্বনাশ দেখতে পেলেন। বহু ভাষাবিদ পণ্ডিত ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহসহ এদেশের অগ্রণী বুদ্ধিজীবী ও সাহিত্যিকরা বাংলাভাষা, বাংলা সাহিত্য, বাঙালি সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য রক্ষায় এগিয়ে আসেন। এ সময়ে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ একটি ভাষণে বলেছিলেন--'আমরা হিন্দু বা মুসলিম যেমন সত্য, তার চেয়ে বেশি সত্য আমরা বাঙালি। এটি কোনো আদর্শের কথা নয়, এটি একটি বাস্তব কথা। প্রকৃতি নিজের

হাতে আমাদের চেহারায় ও ভাষায় বাঙালিত্বের এমন ছাপ দিয়েছেন যে, তা মালা-তিলক-টিকিতে কিংবা টুপি-লুঙ্গি-দাড়িতে ঢাকবার জো-টি নেই।'

আজ পূর্ব বাংলা স্বাধীন হওয়ার কয়েকযুগ পরেও এখনও পাকিস্তান তেমনি আদর্শিক সংকটে ভুগছে।

অনুশীলনমূলক কাজ

কাজ- ১ : পাকিস্তান সৃষ্টির পর পর বাঙালি মুসলমানদের স্বপ্ন ভঙ্গ হলো কেন?

কাজ- ২ : বাঙালি জাতি প্রসঙ্গে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর উক্তিটি উদ্ধৃত কর।

পাঠ-২ : রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন

পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঘোষণা করেন––পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু। ১৯৪৮ সনের মার্চ মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলে ছাত্র-শিক্ষকদের সমাবেশে তিনি এ ঘোষণা দিলে ছাত্ররা 'না না না'–– ধ্বনিতে প্রতিবাদ জানায়। দেশের শিক্ষাবিদ-সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবী এবং অধিকাংশ রাজনৈতিক নেতা বাংলা ভাষার পক্ষে অবস্থান নেন। পাকিস্তান গণপরিষদে বাঙালি সদস্য একাত্তরের শহিদ কুমিল্লার ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত রাষ্ট্রভাষা বাংলার পক্ষে প্রস্তাব উত্থাপন করেন। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান এ প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করেন। দুঃখের বিষয় মুসলিমলীগের অনেক বাঙালি সদস্যও এই বিরোধিতায় যোগ দিয়েছিলেন। অথচ বাংলারই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হওয়া ছিল যুক্তিযুক্ত। পাকিস্তানের তৎকালীন মোট জনসংখ্যা ছিল ৬ কোটি ৯০ লক্ষ। এর মধ্যে ৪ কোটি ৪০ লক্ষ বাঙালি। বাকি আড়াই কোটি মানুষের মাতৃভাষা কিন্তু উর্দু নয়।

তাদের স্ব-স্ব মাতৃভাষা সিন্ধি, পাঞ্জাবি, পশতু ও বালুচ তত উন্নত না হওয়ায় তাদের শিক্ষার মাধ্যম ছিল উর্দু। দেশের সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর ভাষাকে সংখ্যাগুরু বাঙালির উপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল পাকিস্তান। অথচ বাঙালিরা কিন্তু কেবল বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি করে নি। তারা উর্দুর পাশাপাশি রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলারও স্বীকৃতি চেয়েছিল।

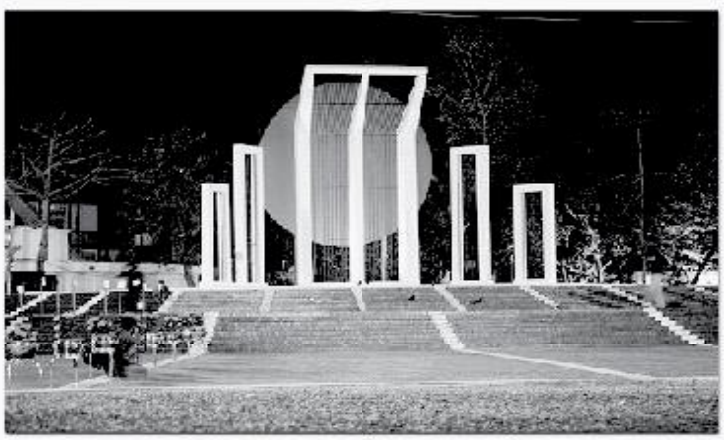

কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার

মাতৃভাষার অধিকারের জন্যে প্রদেশে একাধিক উদ্যোগের কথা জানা যায়। এরমধ্যে প্রগতিশীল রাজনীতিবিদ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সমন্বয়ে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। এর নেতৃত্বে ছাত্র ও তরুণদের মধ্যে সক্রিয় ছিলেন কাজী গোলাম মাহবুব, শওকত আলী, গাজীউল হক, মোহাম্মদ তোয়াহা, আবদুল মতিন, শেখ মুজিবুর রহমান প্রমুখ।

১৯৪৮ সালের ১১ই মার্চ ভাষার দাবিতে ধর্মঘট ডাকা হলে অলি আহাদ, শেখ মুজিবুর রহমান, কাজী গোলাম মাহবুবসহ অধিকাংশ নেতা গ্রেপ্তার হন। দমন-পীড়নে আন্দোলন কিন্তু বন্ধ হয় নি। বরং

আন্দোলনের পথ ধরে ১৯৫২ সালের শীতে ঢাকায় গণ-পরিষদের অধিবেশন বসলে ছাত্ররা গণ-পরিষদ ঘেরাও করে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে স্মারকলিপি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। দিনটি ছিল ২১শে ফেব্রুয়ারি।

মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমিনের নেতৃত্বে মুসলিমলীগ সরকার ছাত্রদের বাধা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। সরকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় ১৪৪ ধারা জারি করে। অর্থাৎ চারজনের বেশি একজোট হয়ে রাস্তায় মিছিল করতে পারবে না। কিন্তু সংগ্রামী ছাত্ররা তা মানবে কেন? তারা মাতৃভাষার মর্যাদা ও অধিকার রক্ষায় আপোসহীন সাহসী ভূমিকা নিতে প্রস্তুত। আগের রাতে সভা করে ছাত্ররা ১৪৪ ধারা ভেঙে মিছিল বের করার সিদ্ধান্ত নেয়।

সেদিন আন্দোলনকারীদের ঠেকাতে পুলিশ অস্ত্র হাতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। প্রথমে তারা লাঠি চার্জ করলো ও কাঁদানে গ্যাস ছুঁড়লো। তাতেও দমাতে পারলো না বিক্ষোভকারীদের। মিছিলে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন আবদুল মতিন ও গাজীউল হক। এবার গুলি চালালো পুলিশ। গুলিতে নিহত হলেন রফিক উদ্দিন, আব্দুল জব্বার এবং আবুল বরকত। আহতের সংখ্যা ছিল অনেক। তাদের ঢাকা মেডিকেল কলেজে ভর্তি করা হয়। এদের মধ্যে আবদুস সালাম চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান। নয় বছরের কিশোর ওহিউল্লাহও পুলিশের গুলিতে নিহত হয়েছিল। তাঁরা সবাই ভাষা শহিদ।

ভাষা আন্দোলনে শহিদের কয়েকজন

যেখানে ছাত্র হত্যা করা হয়েছে সেই স্থানে ২৩শে ফেব্রুয়ারি তৈরি করা হয় একটি শহিদ মিনার। ১৯৬৩ সালে এই অস্থায়ী মিনারটির স্থলে বড় করে শহিদ মিনার তৈরি করা হয়। এটিই ঢাকা মেডিকেল কলেজের সামনে গড়া কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার।

ভাষা আন্দোলন থেকে অর্জন

বাঙালি বুকের রক্ত দিয়ে মাতৃভাষার সম্মান রক্ষা করতে পেরেছিল। শেষ পর্যন্ত পূর্ব বাংলার আইনসভা বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এভাবে ১৯৫৬ খ্রিষ্টাব্দে রচিত পাকিস্তানের সংবিধানে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলার স্বীকৃতির মাধ্যমে ভাষা আন্দোলনের সমাপ্তি ঘটে। বাংলা এবং উর্দু দুই ভাষাই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা লাভ করে।

মাতৃভাষার স্বীকৃতি পেয়ে আর সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করে ন্যায্য দাবি আদায়ে সফল হয়ে শিক্ষিত বাঙালির মনে জাতীয় চেতনা জোরদার হয়। বাংলাভাষা, বাংলা সাহিত্য এবং বাঙালির হাজার বছরের সংস্কৃতি নিয়ে সে গর্ব ও আত্মবিশ্বাস ফিরে পায়।

ভাষার জন্য বাঙালির এই মহান আন্দোলনকে শ্রদ্ধা জানায় বিশ্ববাসী। ১৯৯৯ খ্রিষ্টাব্দে আমাদের ভাষা আন্দোলন আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করে। সে বছর ১৭ই নভেম্বর ইউনেস্কো ২১শে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা দেয়। তাই এখন প্রতিবছর ২১শে ফেব্রুয়ারি পৃথিবীর সকল জাতি নিজ নিজ মাতৃভাষাকে বিশেষ সম্মান জানিয়ে স্মরণ করে। সেই সাথে স্মরণ করে ভাষার জন্য বাঙালির আত্মত্যাগের কথা।

অনুশীলনমূলক কাজ

কাজ- ১ : রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের কারণগুলো উল্লেখ কর।

কাজ- ২ : ভাষা আন্দোলনের ফলাফল সম্পর্কে তোমার ধারণা নিজের ভাষায় লেখ।

পাঠ- ৩ : যুক্তফ্রন্ট

পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই শাসকদের ষড়যন্ত্রে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের মনে ক্ষোভ দানা বাঁধতে থাকে। আত্মরক্ষা ও আত্মবিকাশের প্রশ্নে নানা মতের মানুষ এক হতে থাকেন। ক্ষমতাসীন দল মুসলিমলীগ যেন ষড়যন্ত্র আর শোষণের প্রতীক হয়ে উঠে। বাঙালি জাতির জন্যে এ ছিল ক্রান্তিকাল। ক্ষমতাসীন মুসলিমলীগকে পরাজিত করে বাঙালির অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে এদেশের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দল ও নেতৃবৃন্দ মিলে নির্বাচনকে সামনে রেখে ১৯৫৪ সালে একটি জোট গঠন করেন। এ জোটই যুক্তফ্রন্ট নামে পরিচিত। নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে।

যুক্তফ্রন্ট গঠন ও ২১ দফা কর্মসূচি

যুক্তফ্রন্টে কয়টি দল ছিল এবং কোন কোন দল তা এখন জেনে নিই। এটি কিন্তু পাকিস্তানের দুই অংশের পার্লামেন্ট বা সংসদ নিয়ে গঠিত জাতীয় পরিষদের নির্বাচন ছিল না। এটি ছিল শুধু পূর্ব বাংলার আইন পরিষদের নির্বাচন। এ নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টে যোগ দেয় আওয়ামী মুসলিম লীগ, কৃষক শ্রমিক পার্টি, নেজামে ইসলামী এবং গণতন্ত্রী দল। ১৯৪৯ সালে গঠিত হয় আওয়ামী মুসলিম লীগ। এই দলই ছিল বড়। ১৯৫৫ সাল থেকে 'মুসলিম' শব্দটি বাদ দিয়ে দলটির নাম হয় আওয়ামী লীগ। ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগসহ মোট ১৬টি দল এ নির্বাচনে

শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক

মাওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী

অংশ নেয়। তবে মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয় যুক্তফ্রন্ট ও মুসলিম লীগের মধ্যে। যুক্তফ্রন্ট 'নৌকা' প্রতীক নিয়ে নির্বাচন করে। যুক্তফ্রন্টের নেতৃত্বে ছিলেন তৎকালীন বাংলার তিন প্রবীণ নেতা – শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক, মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী এবং হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী।

হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী

শেখ মুজিবুর রহমান

তরুণদের মধ্যে শেখ মুজিবুর রহমান সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন ও জনপ্রিয় হয়ে উঠেন।

যুক্তফ্রন্ট জনগণের সামনে তাদের ২১ দফা কর্মসূচি প্রকাশ করে। এতে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলার স্বীকৃতি, জমিদারি প্রথা বাতিল, পাটশিল্প জাতীয়করণ, সমবায়ভিত্তিক কৃষি ব্যবস্থা, বিনে পয়সায় ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষাদান অন্তর্ভুক্ত করে। এছাড়া সমস্ত অন্যায় আইনকানুন বাতিল, ৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের শহিদ স্মরণে শহিদ মিনার নির্মাণ, ২১শে ফেব্রুয়ারি সরকারি ছুটি ঘোষণা এবং পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসনের কথাও বলা হয়। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নয়নের জন্যে বাংলা একাডেমি প্রতিষ্ঠার কথাও এতে ছিল।

নির্বাচনের ফলাফল

তখন মুসলমান ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের আলাদা আসন ছিল, আলাদা ভোট হতো। পূর্ব বাংলা আইন পরিষদ নির্বাচনে ২৩৭ মুসলিম আসনের মধ্যে যুক্তফ্রন্ট ২২৩ আসন পেয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। আওয়ামী মুসলিম লীগ তাদের জন্য বরাদ্দকৃত ১৪৩টি আসনের মধ্যে সব কয়টিতে জয়লাভ করে জনপ্রিয়তার প্রমাণ দেয়। আর ক্ষামতাসীন মুসলিম লীগের সকল মন্ত্রী পরাজিত হন এবং দলটি মাত্র ১০টি আসন পায়। যুক্তফ্রন্টের এ বিজয়কে দেশ-বিদেশের পত্রপত্রিকা 'ব্যালট বিপ্লব' বলে আখ্যায়িত করে।

এ নির্বাচন ছিল পূর্ব-বাংলায় প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটে প্রথম সর্বজনীন নির্বাচন। বাঙালি জাতি নিজেদের অধিকার রক্ষার জন্য উজ্জীবিত হয়ে যুক্তফ্রন্টের নৌকা প্রতীকে ভোট দেয়। শুধু ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করে মানুষকে যে ধোঁকা দেয়া যায় না মুসলিম লীগের ফলাফল বিপর্যয়ে তা প্রমাণিত হয়। ভাষা ও সংস্কৃতি বিরোধী অবস্থান নিয়ে কঠোর দমননীতি ও স্বৈরশাসন চালিয়ে কোনো সরকার যে টিকে থাকতে পারে না তাও প্রমাণিত হয়। বাঙালির নতুন এ জাতীয়তাবাদী চেতনা পরবর্তীকালে সকল আন্দোলন ও নির্বাচনে প্রেরণা জুগিয়েছে। আর অন্যদিকে মুসলিমলীগ একটি গণবিরোধী দল হিসেবে পরিচিত হয়। ১৯৫৭ সালের মধ্যে দলটি বহুধা বিভক্ত হয়ে পাকিস্তানের রাষ্ট্রক্ষমতা থেকে বিদায় নেয়। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে এ দলটি একটি আসনও পায়নি।

মুসলিমলীগের পরাজয় ও যুক্তফ্রন্টের বিজয়ের কারণ

স্বাধীনতার পর থেকে মুসলিম লীগের ভূমিকা বাঙালিকে ক্ষুব্ধ করেছিল। আর ভাষা আন্দোলনের বিজয়ের ফলে দেশে রাজনৈতিক পরিবর্তনের জন্যে তাদের আকাঙ্ক্ষা বেগবান হয়ে উঠে। যুক্তফ্রন্টে বিভিন্ন দল ও মতের মানুষ একত্রিত হয়েছিল। এটি যুক্তফ্রন্টের সহজ বিজয়ের অন্যতম কারণ। এ দলের কর্মসূচিতে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটে। বাংলাভাষার মর্যাদা দান, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন, কৃষক, শ্রমিক, ছাত্রসহ সকল শ্রেণির মানুষের কথা এতে ছিল। ২১ দফা কর্মসূচিও তাদের সহজ বিজয়ের কারণ। যুক্তফ্রন্টে প্রবীণ-তরুণ নেতা ও কর্মীর সমন্বয় ঘটে। পাশাপাশি তরুণদের প্রচার অভিযান ছিল চোখে পড়ার মতো। অন্যদিকে মুসলিম লীগের কর্মসূচি ছিল অস্পষ্ট ও গোঁজামিলে ভরা। গণবিচ্ছিন্ন নেতা-কর্মীরা যুক্তফ্রন্টের কর্মীদের প্রচারাভিযানের জোয়ারে ভেসে যান। মুসলিম লীগের দুঃশাসন, দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি, শোষণ, দলের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব, দুর্নীতি, পাকিস্তানের দুই অংশের বৈষম্য ইত্যাদি ছিল মুসলিমলীগের পতনের কারণ।

অনুশীলনমূলক কাজ

কাজ- ১ : যুক্তফ্রন্টের ২১ দফার মূল দাবিগুলো লেখ।

কাজ- ২ : পৃথক পৃথক ছকে মুসলিম লীগের পরাজয় ও যুক্তফ্রন্টের জয়ের কারণগুলোর তালিকা তৈরি কর।

পাঠ-৪ : গণআন্দোলন থেকে গণঅভ্যুত্থান

সামরিক শাসন ও গণআন্দোলনের সূচনা

পাকিস্তানের ষড়যন্ত্র কখনও থেমে থাকে নি। তা বরাবর অব্যাহত ছিল। দুই মাসের মাথায় বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করে যুক্তফ্রন্ট সরকার ভেঙে দেওয়া হয়। এরপরে পাকিস্তানের সংবিধান অনুযায়ী বেসামরিক সরকার গঠন করা হলেও আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি দেখিয়ে ইস্কান্দার মীর্জা ১৯৫৮ সালের ৭ই অক্টোবর দেশে সামরিক আইন জারি করেন। সকল রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। প্রধান সামরিক শাসক নিযুক্ত করা হয় প্রধান সেনাপতি জেনারেল মুহম্মদ আইয়ুব খানকে। এসময় আবুল মনসুর আহমদ ও শেখ মুজিবুর রহমানসহ বহু বাঙালি নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়। ২০ দিনের মধ্যেই আইয়ুব খান তার নিয়োগকর্তা ইস্কান্দার মীর্জাকে পদচ্যুত করে পাকিস্তান ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য করেন। এবার তিনি নিজেকে ঘোষণা করেন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট।

আইয়ুব খানের শাসনকালে ধীরে ধীরে বাঙালি ঐক্যবদ্ধ হয়। তারা এক পর্যায়ে সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করে। আইয়ুব খানের নানা অত্যাচারেও বাঙালি পিছু হটেনি। বিভিন্ন দাবিতে রাজপথ প্রকম্পিত হতে থাকে।

ছাত্র আন্দোলন

আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্ররা প্রথম আন্দোলন গড়ে তোলে। শিক্ষার ক্ষেত্রে পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে বৈষম্য তৈরি করেছিল পাকিস্তান শাসকরা। পূর্ব পাকিস্তানে শিক্ষার জন্য খুব কম অর্থ বরাদ্দ করা হতো। এখানে প্রয়োজনের তুলনায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও ছিল কম। ১৯৫৮ থেকে

১৯৬২ সাল পর্যন্ত রাজনীতি নিষিদ্ধ ছিল এবং তখন অনেক রাজনৈতিক নেতাকে কারাগারে বন্দি করা হয়। এই রাজনৈতিক শূন্যতা পূরণের জন্য বাঙালি ছাত্ররা এগিয়ে আসেন। ১৯৬২ সালে আইয়ুব খান একটি সংবিধান রচনা করেন। এই সংবিধানে বাঙালির গণতান্ত্রিক আকাঙ্ক্ষা ক্ষুণ্ন হয়, সকল ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করে প্রেসিডেন্ট পদ্ধতির শাসনের বিধান রাখা হয়। ১৯৬২-এর মাঝামাঝি এই সংবিধান বাতিলের দাবিতে ছাত্ররা আন্দোলন গড়ে তোলে। তবে ছাত্রদের আন্দোলন অনেক বেশি জোরালো রূপ পায় সরকার শিক্ষানীতি ঘোষণা করলে। শরিফ কমিশন নামে পরিচিত এই শিক্ষা নীতিতে বাংলার বদলে পাকিস্তানের দুই অংশের জন্য অভিন্ন বর্ণমালা চালু করা, অবৈতনিক শিক্ষা বাতিল করা, উচ্চশিক্ষা লাভের সুযোগ কমিয়ে দেয়া ইত্যাদি বিধান যোগ করা হয়েছিল।

এই শিক্ষানীতি বাতিলের জন্য ছাত্ররা আন্দোলন গড়ে তোলে। এই আন্দোলন ধীরে ধীরে দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছড়িয়ে পড়ে। ছাত্রদের তীব্র আন্দোলনের ফলে শেষ পর্যন্ত সরকার শরিফ কমিশন বাতিল করতে বাধ্য হয়।

ছয় দফার জনসভায় শেখ মুজিবুর রহমান

শেখ মুজিবের অনন্য ভূমিকা

এবার অধিকার আদায়ের জন্য বাংলার মানুষ নতুন করে রাজপথে নামে। স্বাধিকার রক্ষার আন্দোলনে প্রধান নেতৃত্বে চলে আসেন শেখ মুজিবুর রহমান। ১৯৬৬ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি লাহোরে বিরোধী দলের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এখানে শেখ মুজিব পূর্ব পাকিস্তানে বাঙালির সব ধরনের অধিকার ফিরে পাওয়ার জন্য ৬ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করেন। এই ৬ দফা ছিল মূলত স্বায়ত্বশাসনের দাবি। অর্থাৎ পাকিস্তানের সাথে যুক্ত থেকেই পূর্ব পাকিস্তানের শাসনের দায়িত্ব ও ক্ষমতা থাকবে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের হাতে।

৬ দফা : বাংলার মানুষের মুক্তির দলিল

৬ দফার মাধ্যমে কী কী দাবি করা হয়েছিল তা এবার জেনে নিই।

১. ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পাকিস্তান রাষ্ট্রটি গঠিত হয়েছিল। তখন বলা হয়েছিল নতুন দেশটিতে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার থাকবে। আর আইনসভা বা সংসদ গঠিত হবে প্রাপ্তবয়স্ক সকল নাগরিকের ভোটে। পাকিস্তান সরকারকে এই প্রস্তাব বাস্তবায়ন করতে হবে।

২. পূর্ব-পাকিস্তানের নির্বাচিত নেতারা নিজের মতো করে দেশ শাসন করবেন। কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে থাকবে শুধু দেশরক্ষা ও বৈদেশিক নীতি নির্ধারণের দায়িত্ব।

৩. পূর্ব ও পশ্চিম-পাকিস্তানের জন্য দুটো ভিন্ন মুদ্রা চালু থাকবে, তবে দুই অংশেই তা সহজে ব্যবহার করা যাবে।

৪. আঞ্চলিক সরকার যার যার অঞ্চলের সকল প্রকার ট্যাক্স ও খাজনা ধার্য এবং আদায়ের ক্ষমতা রাখবে। আদায় করা অর্থের একটি অংশ কেন্দ্রীয় সরকারের খাতে জমা হবে।

৫. প্রতি অঞ্চলের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের হিসাব আলাদা করে রাখতে হবে। আঞ্চলিক সরকারই বিদেশের সাথে বাণিজ্য চুক্তি ও আমদানি-রপ্তানি করার অধিকার রাখবে।

৬. পূর্ব-পাকিস্তানের জন্য আলাদা করে একটি আধা-সামরিক বাহিনী গঠন করতে হবে।

৬ দফা দাবির প্রতিক্রিয়া

৬ দফা দাবি দেখে শঙ্কিত হয়ে যান আইয়ুব খান। কারণ স্বায়ত্বশাসন পেয়ে গেলে বন্ধ হয়ে যাবে পূর্ব-পাকিস্তানে শোষণ। তাছাড়া একসময় অঞ্চলটি স্বাধীন হয়ে যাওয়ার আশঙ্কাও তারা করত। এভাবে কমে যাবে তাদের বৈদেশিক মুদ্রার ভাগ। কারণ পূর্ব-পাকিস্তানে উৎপাদিত পাট বিক্রির টাকাই ছিল পাকিস্তানের বিদেশি মুদ্রা আয়ের সবচেয়ে বড় মাধ্যম। কিন্তু এই টাকা পূর্ব-পাকিস্তানের উন্নতিতে ব্যয় না করে ব্যয় করা হতো পশ্চিম-পাকিসস্তানের সামরিক ও বেসামরিক ক্ষেত্রে। বড় বড় চাকুরিতে বাঙালিকে খুব কমই সুযোগ দেয়া হতো। কিন্তু স্বায়ত্বশাসন পেয়ে গেলে পশ্চিম-পাকিস্তানিদের একচেটিয়া সুবিধা পাওয়া সম্ভব হবে না। তাই আবার শুরু হয় ষড়যন্ত্র। এই সময় শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে সরকার প্রদেশের নানা জেলায় মামলা দিতে থাকে। আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীদের গ্রেপ্তার করে তাদের বিরুদ্ধে মামলা দিতে থাকে। এভাবে চরম হয়রানির শিকার হন শেখ মুজিবুর রহমান ও তাজউদ্দিন আহমদসহ আওয়ামী লীগের নেতারা। কিন্তু বিপুল জনসমর্থন ও শেখ মুজিবসহ নেতৃবৃন্দের দৃঢ়তার ফলে কিছুতেই আন্দোলন দমানো যায় নি।

অনুশীলনমূলক কাজ

কাজ- ১ : সামরিক শাসন-বিরোধী আন্দোলনের সূচনা হলো কেন?

কাজ- ২ : ১৯৬২ সালের ছাত্র আন্দোলনের কয়েকটি কারণ উল্লেখ কর।

কাজ- ৩ : ৬ দফার-দফাগুলো বর্ণনা কর।

পাঠ-৫ : ঐতিহাসিক আগরতলা মামলা (রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান এবং অন্যান্য)

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনীতির চূড়ান্ত লক্ষ্য ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতা। তাঁর বিশ্বাস ছিল যে, সশস্ত্র সংগ্রাম ব্যতীত বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন করা সম্ভব নয়। তাই তিনি সশস্ত্র পন্থায় বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য গঠিত বিপ্লবী পরিষদের সদস্যদের তাঁদের পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য সম্মতি দিয়েছেলেন। বিপ্লবী পরিষদের পরিকল্পনা ছিল "একটি নির্দিষ্ট রাত্রে এবং একটি নির্দিষ্ট সময়ে বাঙালিরা বিভিন্ন গ্রুপে বিভক্ত হয়ে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের সবগুলি ক্যান্টনমেন্টে কমান্ডো স্টাইলে হামলা চালিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানীদের অস্ত্র কেড়ে নিয়ে তাদের বন্দি করবে এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করবে।"

পরিকল্পনাটি বাস্তবায়িত হওয়ার পূর্বেই তা ফাঁস হয়ে যায়। ফলে অনিবার্যভাবেই জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ ৩৫জন সামরিক বেসামরিক কর্মকর্তা ও রাজনৈতিক ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে মামলা হয় ও তাঁদের গ্রেফতার করা হয়। পাকিস্তানি শাসকদের উদ্দেশ্য ছিল এ মামলায় বঙ্গবন্ধুকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে স্বাধীনতা আন্দোলনকে স্তব্ধ করে দেওয়া। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ছাত্র জনতার তীব্র আন্দোলনের মুখে পাকিস্তান সরকার এ মামলা প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হয়।

১১ দফা আন্দোলন

কিন্তু বিপ্লবী বাঙালি দমে যাবার পাত্র নয়। শুরু হয়ে যায় ব্যাপক গণআন্দোলন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা ৬ দফার পাশাপাশি নতুন ১১ দফা আন্দোলন নিয়ে মাঠে নামে। ১১ দফা কর্মসূচিতে মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা ও অফিস আদালতে বাংলাভাষা চালু, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্স বাতিলসহ বিশ্ববিদ্যালয়ে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন, ছাত্র বেতন ৫০ভাগ কমানো, যানবাহনে ছাত্রদের ৫০ ভাগ কম ভাড়া গ্রহণ– এসব দাবি যুক্ত করা হয়। এ ছাড়াও ১১ দফার মধ্যে আরও অনেক ন্যায়সঙ্গত দাবি ছিল। এগুলোর মধ্যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধি, খাজনা ও ট্যাক্স কমানো, ব্যাঙ্ক, বীমা ও শিল্প প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ করা, রাজবন্দীদের মুক্তি ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান

১৯৬৬ সালে বঙ্গবন্ধু ৬ দফা দাবি ঘোষণা করার পর থেকেই সারা পূর্ব-পাকিস্তানের মানুষের মনে একদিকে ক্ষোভের আগুন জ্বলে উঠে আর অন্যদিকে ভবিষ্যত নিয়ে আশাবাদ সৃষ্টি হয়। ছাত্রদের ১১ দফার আন্দোলন এ স্বতঃস্ফূর্ত জাগরণকে আরও ব্যাপক ও জোরদার করে। আর পুলিশি নির্যাতনের একটি ঘটনা মানুষের প্রতিবাদী চেতনা ও আন্দোলনের স্পৃহাকে উজ্জীবিত করে। এরমধ্যে ঐতিহাসিক আগরতলা মামলা যেমন বঙ্গবন্ধুকে কিংবদন্তীর নায়কে রূপান্তরিত করেছে তেমনি পাকিস্তানের প্রতি মানুষের ঘৃণা ও ক্ষোভকে বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। রাজশাহীতে অধ্যাপক শামসুজ্জোহা, বন্দি অবস্থায় সার্জেন্ট জহুরুল হক, মিছিলে ছাত্রনেতা আসাদ এবং কিশোর মতিউরের

শহিদ আসাদ

শহিদ সার্জেন্ট জহুরুল হক

শহিদ ড. শামসুজ্জোহা

মৃত্যু আন্দোলনকে গণঅভ্যুত্থানে রূপ দিয়েছে। ১৯৬৯ সালের জানুয়ারি থেকে শুরু করে ২৫শে মার্চ তাঁর পতন পর্যন্ত সংঘটিত গণঅভ্যুত্থানের জোয়ারে আইয়ুবের স্বৈরশাসন টিকে থাকতে ব্যর্থ হয়। আইয়ুব খান ২২শে ফেব্রুয়ারি আগরতলা মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার করে সকল বন্দিকে নিঃশর্ত মুক্তির ঘোষণা দিতে বাধ্য হন।

কারামুক্ত শেখ মুজিবকে ২৩শে ফেব্রুয়ারি রেসকোর্স ময়দানে (বর্তমানে সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) বিশাল গণসংবর্ধনা দেওয়া হয়। এখানে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে তাঁকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। জাতির প্রতি শেখ মুজিবুর রহমানের বিশাল অবদানের কথা স্মরণ করে আমরা সব সময় তাঁর নামের আগে 'বঙ্গবন্ধু' সম্ভাষণ করব।

গণঅভ্যুত্থানের গুরুত্ব

ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান ছিল আইয়ুব খানের শাসনামলে সবচেয়ে শক্তিশালী আন্দোলন। যদিও সাধারণ দাবি নিয়ে এ আন্দোলন শুরু হয়েছিল কিন্তু ক্রমান্বয়ে তা জনগণের স্বায়ত্তশাসন ও অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে পরিণত হয়। মাত্র তিন মাসের মধ্যে আন্দোলন ঢাকা শহর পেরিয়ে গ্রামে-গঞ্জে ছড়িয়ে পড়ে। জনগণের ঐক্য, জাগরণ যে স্বৈরাচারী শাসকদের বুলেটের চেয়ে শক্তিশালী তা এ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে প্রমাণিত হয়। এ আন্দোলনের ফলে ছাত্ররা জাতিকে নেতৃত্বের নতুন প্রজন্ম উপহার দেয়। ছাত্রদের ঐক্য রাজনীতিবিদদেরও ঐক্যবদ্ধ করে। শেষ পর্যন্ত আইয়ুব খান পদত্যাগ করতে বাধ্য হন।

এভাবে ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশ ঘটিয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামের অনুপ্রেরণা যোগায়। গণঅভ্যুত্থান বাঙালির সংগ্রামী চেতনাকে শাণিত করে, বাঙালিকে সাহসী জাতিতে রূপান্তরিত করে। সবচেয়ে বড় কথা বাঙালিকে ত্যাগের মন্ত্রে ঐক্যবদ্ধ করে গণঅভ্যুত্থান। এর সূত্র ধরেই পূর্ব বাংলার উপর পশ্চিম-পাকিস্তানের আধিপত্যের অবসান হয়। স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পেছনে ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থানের ভূমিকা অপরিসীম।

অনুশীলনমূলক কাজ

কাজ- ১ : ঐতিহাসিক আগরতলা মামলা (রাষ্ট্র বনাম শেখ মজিবুর রহমান এবং অন্যান্য) সম্পর্কে সংক্ষেপে লেখ।

কাজ- ২ : গণঅভ্যুত্থানে ছাত্র সমাজের ভূমিকা বর্ণনা কর।

কাজ- ৩ : বাঙালির আন্দোলন সংগ্রাম নিয়ে রচিত তোমার জানা কবিতা, গান, গল্প, উপন্যাস ও চলচ্চিত্রের একটি তালিকা প্রস্তুত কর।

পাঠ- ৬ : ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন

আইয়ুব খান পাকিস্তানের সেনা প্রধান ইয়াহিয়া খানের হাতে প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব দিয়ে পদত্যাগ করেন। ক্ষমতা গ্রহণ করেই ইয়াহিয়া খান বাঙালিকে শান্ত করার লক্ষ্যে ১৯৭০ সালে সাধারণ নির্বাচন দেওয়ার অঙ্গীকার করেন।

১৯৭০ সালের নির্বাচন ছিল পাকিস্তানের দুটি অংশের শেষ নির্বাচন। নির্বাচনের ফলাফল ছিল ৬ দফাভিত্তিক বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিজয়। এ নির্বাচনের ফলে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত হয়।

১৯৭০ সালের নির্বাচনী প্রচারণায় বঙ্গবন্ধু

এবার আমরা জেনে নিই কীভাবে এবং কোন কোন দল

এ নির্বাচনে অংশ নেয়। তখন পাকিস্তানের পার্লামেন্ট বা সংসদ ছিল দুইটি। পাকিস্তানের দুই অংশ নিয়ে জাতীয় পরিষদ, এতে সদস্য সংখ্যা ছিল ৩০০। এর মধ্যে জনসংখ্যার ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য বরাদ্দ ছিল ১৬২ এবং বাকি ১৩৮টি পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলের জন্য বরাদ্দ ছিল। পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদে ৩০০ এবং পশ্চিম পাকিস্তানের ৪টি প্রাদেশিক পরিষদের জন্য ছিল ৩০০ আসন। পাকিস্তান সরকার ১৯৭০ সালের ৭ই ডিসেম্বর জাতীয় পরিষদ ও ১৭ই ডিসেম্বর প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করে। পাকিস্তানের মোট ২৪টি দল জাতীয় পরিষদ নির্বাচনে অংশ নেয়। দলগুলোর মধ্যে আওয়ামী লীগ, পাকিস্তান পিপলস পার্টি (পিপিপি), পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি (পিডিপি), জামায়াতে ইসলামী, নেজামে ইসলামী, ইসলামী গণতন্ত্রী দল, ন্যাপ (ওয়ালী) অংশ নেয়।

নির্বাচনের ফলাফল

১৯৭০ সালের নির্বাচন ফলাফলের দিক দিয়ে ছিল খুবই উল্লেখযোগ্য। নির্বাচন মূলত আওয়ামী লীগ ও আওয়ামী লীগ বিরোধী রূপ নিলেও বিরোধী পক্ষ জনগণের কাছাকাছিই পৌঁছাতে পারেনি। জাতীয় পরিষদে পূর্ব-পাকিস্তানের ১৬২ টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ ১৬০টি আসন পায়। পিপিপি পশ্চিম পাকিস্তানে মোট ৮৩ আসন পেয়ে দ্বিতীয় স্থানে থাকে। সংরক্ষিত মহিলা আসনসহ জাতীয় পরিষদে এভাবে ৩১৩ আসনের মধ্যে ১৬৭টি আসন পেয়ে আওয়ামী লীগ একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। এক্ষেত্রে সরকার গঠনের জন্য আওয়ামী লীগের প্রয়োজন ছিল ১৫১টি আসন, যা পাকিস্তানের অন্য কোনো দলের ছিল না। প্রাদেশিক পরিষদেও পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ একইভাবে সফল হয়। এখানে আওয়ামী লীগ ৩১০ আসনের মধ্যে ২৯৮টি আসন পেয়ে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। আওয়ামী লীগ পশ্চিম-পাকিস্তানে কোনো আসন পায়নি আর পিপিপি পূর্ব-পাকিস্তানে কোনো প্রার্থীই দেয়নি।

নির্বাচনের গুরুত্ব

পাকিস্তান সরকারের বহু চেষ্টা সত্ত্বেও আওয়ামীলীগ-বিরোধী দলগুলো নির্বাচনে প্রভাব ফেলতে পারেনি। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকে বাঙালি জাতি ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতির দিক থেকে যে স্বাতন্ত্র্য দাবি করে আসছিল এ নির্বাচনের বিজয়ে যেন তা স্বীকৃতি পায়। এবার নিশ্চিত হওয়া যায় যে, বাঙালি একটি আলাদা জাতি। এ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ পূর্ব-পাকিস্তানে এবং পিপিপি পশ্চিম-পাকিস্তানে প্রাধান্য লাভ করে। ফলে এটাই প্রমাণিত হয় যে, পশ্চিম-পাকিস্তান কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তানকে শাসন করা অবৈধ। বাঙালির এতদিনের স্বায়ত্তশাসন দাবি যে বৈধ তাও প্রমাণিত হয়। এ নির্বাচনে জয়লাভের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালি জাতির মুক্তির প্রতীকে পরিণত হন।

অনুশীলনমূলক কাজ

কাজ- ১ : ১৯৭০ সালের নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী দলগুলো চিহ্নিত কর।

কাজ- ২ : ১৯৭০ সালের নির্বাচনের গুরুত্ব বর্ণনা কর।

পাঠ- ৭ ও ৮ : পূর্ব ও পশ্চিম-পাকিস্তানের বৈষম্য

পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম হওয়ার পর দেখা যায় পশ্চিম-পাকিস্তানি শাসকরা বাঙালিকে আপন করে নিতে পারেনি। আর তাতে এক বিদেশি শাসকের বদলে বাঙালিরা পেলো নতুন বিদেশি শাসক। পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যকার সম্পর্ক হয়ে পড়ল শোষক ও শোষিতের। আমরা হলাম শোষিত শ্রেণির। রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, সামরিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষা, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে পাকিস্তানের পূর্ব ও পশ্চিমাঞ্চলের মাঝে ব্যাপক বৈষম্যের মাধ্যমে বাঙালিদের দমিয়ে রাখার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু বাঙালিরা বিভিন্নভাবে এই শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়। সবশেষে মুক্তিসংগ্রামের মাধ্যমে বাঙালিরা নতুন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে।

রাজনৈতিক বৈষম্য

হাজার মাইলের ব্যবধানে গড়ে উঠা পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে শুরুতেই রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বাঙালিদের প্রতি বৈষম্য করা হয়। পাকিস্তানের জনসংখ্যার বড় অংশ বাঙালি হলেও ঢাকার বদলে করাচিতে নতুন রাষ্ট্রের রাজধানী স্থাপিত হয়। রাষ্ট্রের বড় পদ গভর্নর জেনারেল, প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভার বেশিরভাগ সদস্য পশ্চিম পাকিস্তান থেকে নেওয়া হতো।

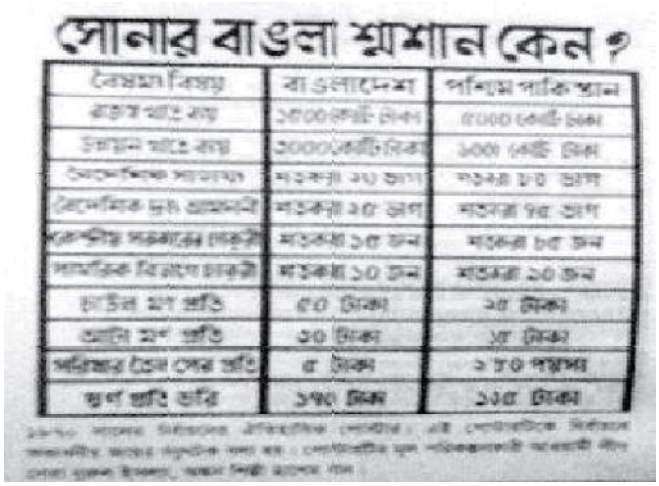

পূর্ব পকিস্তান ও পশ্চিম-পাকিস্তানের বৈষম্যের পোস্টার

১৯৪৭-৭১সাল পর্যন্ত কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের ২১১ জনের মধ্যে বাঙালি ছিলেন মাত্র ৯৫ জন। আইয়ুব খানের আমলে ৬২ জন মন্ত্রীর মধ্যে মাত্র ২২ জন ছিলেন বাঙালি। এসব বাঙালি মন্ত্রীদের আবার গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব দেয়া হয়নি।

১৯৫৮ সালে সামরিক শাসন জারি করা হয়। সামরিক শাসনে রাজনৈতিক দলের কর্মকাণ্ড, সংসদ কার্যক্রম, মৌলিক অধিকার সব স্থগিত করে রাখা হয়। আইয়ুব আমলে (১৯৫৮-৬৯) বাঙালি রাজনীতিবিদদের দমনে জেল, জরিমানা ছাড়াও বিভিন্ন আদেশ ও অধ্যাদেশের মাধ্যমে নির্বাচনে অযোগ্য ঘোষণা করা হয়। এমনকি ষড়যন্ত্রমূলকভাবে বঙ্গবন্ধুকে প্রহসনের বিচারে ফাঁসি দেয়ার জন্য তাঁকেসহ ৩৫ জনের বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক আগরতলা মামলা (রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান এবং অন্যান্য) দায়ের করে সরকার। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জয়ী হলেও তাদের সরকার গঠন করতে দেয়া হয়নি। এর ফলে পাকিস্তান রাষ্ট্রকাঠামোর মধ্যে বাঙালির স্বায়ত্তশাসনের দাবি স্বাধীনতার দাবিতে রূপান্তরিত হয়।

প্রশাসনিক বৈষম্য

একটি নবীন উন্নয়নশীল রাষ্ট্রে সাধারণত সরকারি চাকরিতেই বেশির ভাগ মানুষ যোগ দিতে চায়। এতে রাষ্ট্র কোনো বৈষম্য বা বাধা সৃষ্টি করলে তা হবে মৌলিক অধিকার ও মানবাধিকার লংঘন। সংবিধানেও আমাদের নিজ নিজ পেশা গ্রহণের নিশ্চয়তা দেওয়া হয়। অথচ পাকিস্তান আমলে রাষ্ট্র স্বয়ং বৈষম্যকে রাষ্ট্রনীতি হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। প্রশাসনিক ক্ষেত্রে বাঙালিরা যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও

ন্যায্য পদ থেকে বঞ্চিত হতো। নিজেদের লোকদের বেশি ও গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ দিয়ে পাকিস্তানকে তারা নিয়ন্ত্রণ করত। এ কারণে সরকারি পদে বেশির ভাগ ছিল পশ্চিম-পাকিস্তানি। গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয় যেমন প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে বাঙালিদের বড় পদে নেয়া হতো না। এক্ষেত্রে পাকিস্তানের প্রথম শ্রেণির পদে মাত্র ২৩ ভাগ বাঙালি নেয়া হতো। তাছাড়া কেন্দ্রীয় ব্যাংক, রেলওয়ে, কর্পোরেশনসহ সরকার নিয়ন্ত্রিত বিভিন্ন কার্যালয়ে বাঙালিদের নিয়োগে একই রকম বৈষম্য করা হতো।

সামরিক ক্ষেত্রে বৈষম্য

সেনা, নৌ, বিমান বাহিনীতেও এ বৈষম্য নীতি বহাল ছিল। পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা বাহিনীর ৩টি সদর দপ্তর ও সমরাস্ত্র কারখানা ছিল পশ্চিম-পাকিস্তানে। সামরিক বাহিনীর অফিসার পদে মাত্র শতকরা ৫ ভাগ ছিলেন বাঙালি। সেনাবাহিনীর মাত্র ৪ ভাগ লোক বাঙালি ছিলেন। নৌ ও বিমান বাহিনীতে কিছু বেশি নিয়োগ দেয়া হলেও তা উল্লেখযোগ্য ছিল না। সামরিক বাহিনীর জন্য বাজেটের শতকরা ৬০ ভাগ বরাদ্দ হতো যার বেশির ভাগ ব্যয় করা হতো পশ্চিম পাকিস্তানে। পদোন্নতির ক্ষেত্রেও ছিল বৈষম্য। এ কারণে আওয়ামী লীগের ৬ দফা দাবিতে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গুরুত্বসহ বিবেচিত হয়। সরকারি অবহেলার কারণে পূর্ব পাকিস্তানের সীমান্ত অরক্ষিত থাকত। ১৯৬৫ সালের যুদ্ধে পূর্ব-পাকিস্তানের নিরাপত্তাহীনতা প্রবলভাবে ধরা পড়ে।

অর্থনৈতিক বৈষম্য

পাকিস্তান রাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় সরকার ছিল সর্ব ক্ষমতার অধিকারী। কেন্দ্রীয় ব্যাংকসহ সকল ব্যাংক, বীমা, বাণিজ্য, শিল্প-প্রতিষ্ঠানের প্রধান অফিস পশ্চিম-পাকিস্তানে ছিল। পূর্ব-পাকিস্তান বৈদেশিক মুদ্রা বেশি আয় করলেও শতকরা ২১ ভাগের বেশি অর্থ পূর্ব-পাকিস্তানে বরাদ্দ দেয়া হয়নি। বৈদেশিক সাহায্যের শতকরা ৩৪ ভাগের বেশি পূর্ব-পাকিস্তান পায়নি। অথচ ঋণের বোঝা বাঙালিদের বহন করতে হতো। এক্ষেত্রে বিদেশ থেকে যা আমদানি করা হতো তার মাত্র ৩১ শতাংশ পূর্ব-পাকিস্তানের উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ ছিল। পূর্ব-পাকিস্তানের উন্নয়নের জন্য কম অর্থ বরাদ্দ হওয়ায় এখানে উন্নয়ন তেমন হয়নি। অথচ আমাদের টাকায় পশ্চিম-পাকিস্তানকে উন্নত করে গড়ে তোলা হয়েছে। এছাড়া পূর্ব-পাকিস্তান থেকে পশ্চিম-পাকিস্তানে প্রচুর সম্পদ পাচার হতো। রপ্তানি আয়ের ২০০০ মিলিয়ন ডলার পাকিস্তান আমলে পূর্ব-পাকিস্তান থেকে পশ্চিম-পাকিস্তানে পাচার হয়েছিল। এই বৈষম্য বোঝানোর জন্যে সে সময়ে ব্যবহৃত একটি প্রতীকী পোস্টার উপস্থাপন করা হলো।

অর্থনৈতিক বৈষম্যের প্রতীকী চিত্র

গরুটি পূর্ব-পাকিস্তানের (বর্তমান বাংলাদেশ) ঘাস খাচ্ছে আর দুধ দোহন করে নিয়ে যাচ্ছে পশ্চিম পাকিস্তানিরা। অর্থাৎ উৎপাদন হয় পূর্ব-পাকিস্তানে আর অর্থ চলে যায় পশ্চিম-পাকিস্তানে।

সাংস্কৃতিক বৈষম্য

পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি ধ্বংস করতে পাকিস্তানি শাসকরা তৎপর হয়ে উঠে। ১৯৪৮ সালে জোরপূর্বক উর্দুকে চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা করে। ১৯৫২ সালে বাংলা ভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠায় বাঙালিকে জীবন দিতে হয়। ১৯৫৬ সালে সংবিধানে বাংলাকে পাকিস্তানের দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে গ্রহণ করা হলেও বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে চক্রান্ত থেমে যায় নি। এ সময় পূর্ব-বাংলার নাম পূর্ব-পাকিস্তান করা হয়। রোমান হরফে বাংলা লেখার চেষ্টা অব্যাহত থাকে। চলচ্চিত্র, নাটক, পত্রিকা, বই প্রকাশে সীমাহীন নিয়ন্ত্রণ ছাড়াও রবীন্দ্রসংগীত প্রচার বন্ধ এবং বাংলা নববর্ষ উদযাপন নিষিদ্ধ করা হয়। এভাবে বাঙালির সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে বিভিন্নভাবে আঘাত হানা হয়।

বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া

বাঙালি লড়াকু জাতি। মুঘল, ব্রিটিশ আমলে বাঙালি অন্যায়ের প্রতিবাদ করেছে। পাকিস্তান সরকারের বৈষম্যমূলক আচরণও বাঙালি জাতি কখনও মুখ বুজে সহ্য করেনি। ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বাঙালিরা পাকিস্তান বিরোধী আন্দোলনের সূচনা করে। ১৯৫৪ সালে মুসলিম লীগকে পরাজিত করে বাঙালি প্রথম স্বল্প সময়ের জন্য সরকার গঠনের সুযোগ পায়। আইয়ুব খানের সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে ছাত্ররা শিক্ষা-আন্দোলনের মাধ্যমে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন শুরু করে। ষাটের দশকে সাহিত্য সম্মেলন, সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মাধ্যমে আইয়ুব বিরোধী তৎপরতা চালানো হয়। ১৯৬১ সালে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মশতবার্ষিকী পালন উপলক্ষে ঢাকা, চট্টগ্রামসহ সারাদেশে সাংস্কৃতিক জাগরণ ঘটে। একই বছর 'ছায়ানট' নামের সাংস্কৃতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হলে বাঙালির সংগীত চর্চা ও বিভিন্ন উৎসব পালনের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক আন্দোলন জোরদার হতে থাকে। পুরো ষাটের দশক জুড়ে চলেছে সাংস্কৃতিক স্বাধিকারের আন্দোলন। ১৯৬৬ সালে ৬ দফার মাধ্যমে বৈষম্য দূরীকরণে বাঙালি নিজেদের দেশ চালানোর পরিকল্পনা পেশ করে। বাঙালির এই দাবি সরকার প্রত্যাখ্যান করলে শুরু হয় ছাত্রদের ৬ ও ১১ দফাভিত্তিক যৌথ আন্দোলন।

গণআন্দোলনের চাপে ঐতিহাসিক আগরতলা মামলা (রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান এবং অন্যান্য) প্রত্যাহার করে আইয়ুব খান পদত্যাগে বাধ্য হন। ১৯৭০ এর নির্বাচনে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। আওয়ামী লীগের এই নিরঙ্কুশ বিজয়েই মূলত স্বাধীনতার লক্ষ্যে এগিয়ে যায় বাঙালি। পাকিস্তান ক্ষমতা হস্তান্তরে নানা ষড়যন্ত্র ও কালক্ষেপণ করতে থাকে, শুরু করে নানা টালবাহানা। ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ মধ্য রাতে পাকিস্তান সেনাবাহিনী নিরস্ত্র বাঙালির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, চালায় হত্যাযজ্ঞ। বঙ্গবন্ধুকে বন্দি করা হয় ঐ রাতে। বঙ্গবন্ধু গ্রেপ্তার হওয়ার আগে ঐ রাতে অর্থাৎ ২৬ শে মার্চের প্রথম প্রহরে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। শুরু হয় মুক্তিযুদ্ধে। শেষ পর্যন্ত ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বিজয় অর্জনের

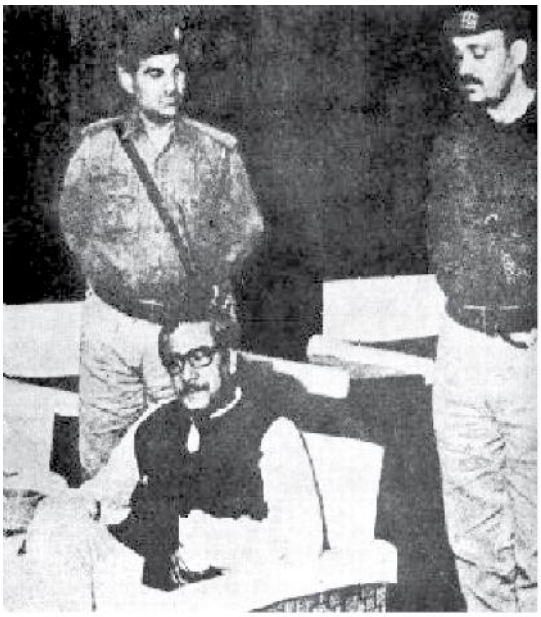

১৯৭১ সালের ২৫ শে মার্চের মধ্য রাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হাতে বন্দি অবস্থায় বঙ্গবন্ধু

মাধ্যমে পাকিস্তানিদের ২৪ বছরের শোষণ আর বৈষম্যের অবসান ঘটায় বাঙালি।
পুরো ষাটের দশক জুড়ে চলচ্চিত্র, নাটক, সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চায়ও বিদেশি প্রভাবের বদলে শিকড়ের সন্ধান শুরু হয়। বিভিন্ন আন্দোলনে শিল্পী, সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীরা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। মুক্তিযুদ্ধেও তারা এ ভূমিকা অব্যাহত রাখেন।

অনুশীলনমূলক কাজ

কাজ- ১ : তদানীন্তন পূর্ব-পাকিস্তানের প্রতি পশ্চিম-পাকিস্তানিরা যে সব ক্ষেত্রে বৈষম্য সৃষ্টি করেছিল তার তালিকা কর।

কাজ- ২ : সামরিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানিদের বৈষম্যের তুলনামূলক চিত্র দেখাও।

কাজ- ৩ : পূর্ব ও পশ্চিম-পাকিস্তানের মধ্যে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বৈষম্যের ক্ষেত্রগুলো চিহ্নিত কর।

কাজ- ৪ : পশ্চিম-পাকিস্তানিদের নিপীড়ন ও বৈষম্যের ফলাফল কী হলো--তার ধারণা দাও।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. পাকিস্তান গণপরিষদে কোন সদস্য রাষ্ট্রভাষা বাংলার পক্ষে প্রস্তাব উত্থাপন করেন?

ক. হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী খ. ধীরেন্দ্র নাথ দত্ত
গ. এ, কে, ফজলুল হক ঘ. মনোরঞ্জন ধর

২. পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টির পরেও দেশে ঐক্য প্রতিষ্ঠা না পাওয়ার কারণ--

i. সম্পদের সুষম বণ্টন না করা
ii. স্বায়ত্বশাসনের দাবির প্রতি অবজ্ঞা করা
iii. সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর ভাষাকে মর্যাদা না দেয়া

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii
গ. i ও ii ঘ. ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও–

রিমি মনোযোগ দিয়ে টেলিভিশনে একটি অনুষ্ঠানের দৃশ্য দেখছিল। একজন নেতা বলিষ্ঠ কণ্ঠে ছাত্র-শিক্ষকদের সমাবেশে রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের পক্ষে ঘোষণা দেন। ছাত্ররা না, না, না– ধ্বনিতে প্রতিবাদ জানাচ্ছে।

৩. উদ্দীপকে বর্ণিত নেতার বক্তব্য কোন আন্দোলনের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়?

ক. রাষ্ট্র ভাষা খ. ঊনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান
গ. একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ ঘ. অসহযোগ আন্দোলন

৪. উক্ত আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ ফলাফল ছিল–

ক. জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ করা

খ. ভাষার সাংবিধানিক স্বীকৃতি প্রদান করা

গ. পৃথক জাতির মর্যাদা দেয়া

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. i ও ii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. বহরমপুর অঞ্চলের জনগণ তাদের দীর্ঘদিনের শাসকের স্বৈরাচারী মনোভাব ও কার্যকলাপে অতিষ্ঠ হয়ে আন্দোলন ও বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। উক্ত স্বৈরশাসক পেশিশক্তির প্রদর্শন, রক্তপাত ঘটিয়েও আন্দোলন স্তিমিত করতে পারেননি। জনগণের ঐক্য, সংগ্রামী চেতনা, আত্মত্যাগের কাছে তাঁর ক্ষমতা দুর্বল হয়ে পড়ে। এক পর্যায়ে গণজাগরণে উক্ত স্বৈরশাসক ক্ষমতা হস্তান্তর করতে বাধ্য হন।

ক. ১৯৫৮ সালে তদানীন্তন পাকিস্তানে সামরিক আইনজারি করেন কে?

খ. ১৯৫৪ সালের প্রাদেশিক নির্বাচনে মুসলিমলীগ কেন পরাজিত হয়? ব্যাখ্যা কর।

গ. বহরমপুরের গণজাগরণে তদানীন্তন পূর্ব-পাকিস্তানের কোন আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. বহরমপুরের জনগণের মনোভাবই পরবর্তীতে স্বাধীনতা সংগ্রামের অনুপ্রেরণা যোগায়– বক্তব্যটি পাঠ্যপুস্তকের আলোকে মূল্যায়ন কর।

২. **ঘটনা-১:** আলমনগরে বিভিন্ন ভাষাভাষী লোকের বাস ছিল। কিন্তু শাসক গোষ্ঠী সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষাকে উপেক্ষা করে। এতে সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী আন্দোলন করে। আন্দোলনের এক পর্যায়ে তাদের ভাষা রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে।

ঘটনা-২: তদানীন্তন পাকিস্তানের বিভক্তি নিয়ে দাদা নাতি গল্প করছিল। দাদা তার নাতি তৌহিদুলকে বললেন তাঁর বাবা আনসারী সাহেব জাতীয় পরিষদের সদস্য ছিলেন। তাঁর দল জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে বিপুল ভোটে জয়ী হওয়া সত্ত্বেও শাসকগোষ্ঠী ক্ষমতা হস্তান্তরে কালক্ষেপণ করেন।

ক. কতজনের বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক আগরতলা মামলা (রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিবুর রহমান এবং অন্যান্য) দায়ের করা হয়?

খ. ৬ দফাকে বাংলার মানুষের মুক্তির দলিল বলা হয় কেন?

গ. ঘটনা-১ : তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের কোন ঘটনার ইঙ্গিত বহন করে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. ঘটনা-২ : ১৯৭০ সালের নির্বাচনে বিজয়ী দলকে ক্ষমতা হস্তান্তর না করার প্রতিচ্ছবি–মূল্যায়ন কর।

অধ্যায়-তিন

বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য

বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীর সংমিশ্রণে গড়ে উঠেছে বলে বাংলার জনমানুষের আকারে, অবয়বে, চেহারায় এত বৈচিত্র্য। তেমনি নানা ভাষাজাতির আগমনে সংস্কৃতিতেও বৈচিত্র্য দেখা যায়। তবে পল্লি ও কৃষিপ্রধান এই দেশে গ্রামীণ জীবনের সংস্কৃতির প্রভাবই বেশি। আবার নদীর খেয়ালি আচরণ আর প্রকৃতির ঋতুবৈচিত্র্য বাঙালি মানসকে বিচিত্রভাবে সমৃদ্ধ করেছে। বাঙালির সংস্কৃতি বুঝতে তার এই বৈচিত্র্যময় পটভূমি খেয়াল রাখা দরকার।

পাঠ-১ : সংস্কৃতিতে প্রকৃতির ভূমিকা

মানুষ পৃথিবীর যে অঞ্চলেই জন্ম নিক আর বাস করুক তার পক্ষে সেখানকার প্রকৃতি, পরিবেশ ও জলবায়ুকে উপেক্ষা করা সম্ভব নয়। বাঙালিও তার সংস্কৃতিতে প্রকৃতিকে উপেক্ষা করেনি। এমন সম্পন্ন প্রাণবন্ত প্রকৃতিকে বাদ দিয়ে বাঙালি সংস্কৃতির কথা ভাবা যায় না।

এখানকার উর্বর মাটি স্বভাবতই মানুষকে কৃষিকাজে উদ্বুদ্ধ করেছে। তাদের ব্যবহার্য তৈজসপত্র বেশির ভাগ ছিল মাটির। কৃষি থেকেই তারা পেয়েছে তুলা যা তাকে কাপড় বুনতে উৎসাহিত করেছে। আর প্রচুর নদী-নালা, খাল-বিল থাকায় মাছ ধরা তার আরেক কাজ। কৃষি, মাটির কাজ, মাছধরা আর তাঁত বোনা – বহুকাল ধরে এ চারটি ছিল বাঙালির প্রধান পেশা। ধীরে ধীরে সমাজের প্রয়োজনে কামার, চর্মকার ও কাঠের কারিগর, স্বর্ণকার প্রভৃতি পেশার প্রসার হতে থাকে। বাংলার প্রকৃতি যেমন উদার ও দানশীল তেমনি সময় সময় ভীষণ খেয়ালি আর নিষ্ঠুরও হতে পারে। নদী ভাঙনে, অনাবৃষ্টিতে, বন্যায়, বজ্রের আঘাতে নিষ্ঠুরতা ভালোই বোঝা যায়। আর তাই মানুষ প্রকৃতিকে নানাভাবে সন্তুষ্ট করতে চেয়েছে বরাবর। বাংলার গ্রামজীবনে এরকম নানা বিশ্বাস ও লোকাচারের প্রচলন রয়েছে গৃহস্থদের মধ্যে। প্রকৃতির খামখেয়ালিপনা মানুষকে জীবনের ভবিষ্যত ও নিজের ভাগ্য সম্পর্কে অনিশ্চয়তায় ভোগায়। এই অনিশ্চিয়তার বোধ তাদের মধ্যে স্রষ্টার সঙ্গে বোঝাপড়ার নিজস্ব ধারণা তৈরি করেছে। এটা বাঙালির একেবারে নিজস্ব ধরন। বাংলার বাউল-ভাটিয়ালি-মারফতিসহ সব ধরনের লোকগানে এসব বোধের প্রকাশ ঘটে।

গ্রামের ঘর

বাংলায় ছয়ঋতুর বৈচিত্র্য থাকলেও শীতকাল ছাড়া বছরের অন্য সময় গরমের প্রাধান্যই বেশি। তাই এখানকার দেশীয় পোশাকে শাড়ি, লুঙ্গি, ধূতি, চাদরের মতো কাপড়ই প্রচলিত ছিল যাতে শরীরে সহজেই বাতাস ঢুকতে পারে।

বাঁশ, শন, মাটি দিয়েই সাধারণ গ্রামের ঘর তৈরি হতো। পোড়ামাটির ফলক, তালপাতার পুঁথি ও ছবি, কাঠের শিল্পকর্ম, শঙ্খের কাজ, মাটির তৈরি সরা ও সখের হাঁড়ি আমাদের কৃষ্টির অংশ। নানা রকম নৌকার প্রচলন আছে এ দেশে– ডিঙি, ছিপ, গয়না, বজরা, ময়ুরপঙ্খী, সাম্পান এমনি কত নাম বলা যায়।

ডিঙি

গয়না

বজরা

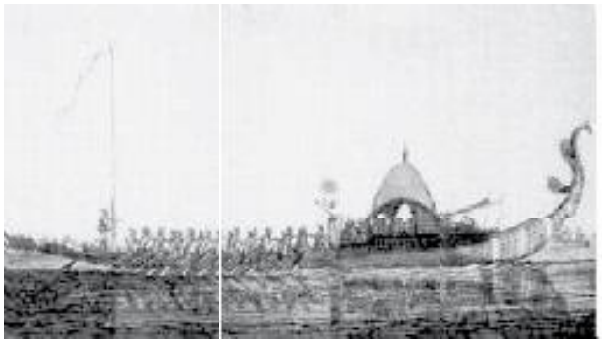

ময়ুরপঙ্খী

সাম্পান

মাছ-ভাতই আমাদের প্রধান আহার্য আজ। তবে শাক-সবজির দিকেও বাঙালির ঝোঁক আছে। পুরনো একটি ছড়ায় আছে– কচি শর্ষে শাক, নতুন চালের ভাত, হড়হড়ে দই-প্রচুর। ধানক্ষেতে দাঁড়িয়ে আকাশ ও ভূমির উদার বিস্তৃতি অনুভব করতে পারে কৃষক। জেলে মাঝি তো বটেই, এই বাংলার জলাভূমিতে যেকোনো মানুষ নদীপথে চলতে চলতে প্রকৃতির একই বিশাল উদারতায় অভিভূত হয়। প্রকৃতিই যেন এখানকার মানুষকে উদার ও মানবিক করে গড়ে তুলেছে।

অনুশীলনমূলক কাজ

কাজ- ১ : বাঙালির সংস্কৃতি ও জীবনে প্রকৃতির প্রভাব উল্লেখ কর।

কাজ- ২ : বাঙালি সংস্কৃতির নিজস্ব ধরন বলতে কী বুঝ?

পাঠ-২ : সংস্কৃতিতে জীবিকার ভূমিকা

বাংলার মানুষের প্রধান জীবিকা কৃষিকাজ। কৃষি সম্পূর্ণ নির্ভর করত প্রকৃতির উপর। বিশেষভাবে মাটি, মেঘ, বৃষ্টি, রোদ এসবের উপর। আমাদের বাংলা ক্যালেন্ডার ও পঞ্জিকা মূলত এই কৃষিসমাজের জীবনযাপনের সাথে সম্পর্ক রেখেই তৈরি। কৃষিকে কেন্দ্র করে নানা রকম আচার-অনুষ্ঠান প্রচলিত ছিল। এর মধ্যে নতুন ধান উঠার পরে হেমন্তকালে হতো নবান্ন উৎসব। শীতকাল জুড়ে নতুন চালের পিঠাপুলি খাওয়ার চল ছিল।

মাটির প্রতি অঙ্গীকার জানিয়ে আমাদের লোক ও নাগরিক সাহিত্যে অনেক গান আছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের দেশাত্মবোধক একটি গানের প্রথম চরণ হলো– ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই মাথা। নজরুলের গানেও মাটির জয়গান গাওয়া হয়েছে।

জেলে ও মাঝিমাল্লারা নদী ও সমুদ্রপথে চলতে গিয়ে আবহমান কাল থেকে স্মরণ করে আসে পীর বদরকে; আবার সুন্দরবন অঞ্চলের মানুষ বনবিবিকে স্মরণ করে নানাভাবে। জাগ্রত প্রকৃতির সাথে জীবিকার সন্ধানে ঝুঁকি নিয়ে চলতে গিয়ে মানুষ এসব আচার-অনুষ্ঠানে জড়িয়েছে।

তাঁতি, চর্মকার, কামার-কুমোর-স্বর্ণকার প্রভৃতি কারিগরশ্রেণিও নিজেদের পেশার প্রতি একাগ্রতা নানা আচার-অনুষ্ঠানে প্রদর্শন করে আসছে। কারিগর ও বণিকরা বিশেষভাবে নববর্ষের দিনে হালখাতা উদ্বোধন করে।

আমাদের লোকসংস্কৃতিতে এভাবে মানুষের জীবনযাপনের নানা চিত্র ফুটে উঠে।

অনুশীলনমূলক কাজ

কাজ- ১ : আমাদের লোকসংস্কৃতিতে সাধারণ মানুষের জীবনযাপনের কী চিত্র ফুটে উঠে?

পাঠ-৩ : সংস্কৃতিতে ধর্মের ভূমিকা

ধর্ম মানুষের ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে খুবই বড় ভূমিকা পালন করে। একসময় এদেশে অধিকাংশ মানুষ ছিল প্রকৃতি-পূজারী। তারা যেমন প্রকৃতির বড় শক্তি হিসেবে আকাশ, বাতাস, সূর্য, চন্দ্রকে পূজা করত তেমনি প্রকৃতির জীবন্ত উপাদান নদী, সমুদ্র, বৃক্ষ প্রভৃতিকেও ভজনা করেছে। ব্রাহ্মণ্য ধর্ম প্রচারিত হওয়ার পর প্রচলিত পুরোনো দেবদেবীর কিছু থেকে গেল। আর কিছু দেবদেবী নতুন যুক্ত হলো। স্থানীয় ভক্তিগীত, মন্ত্র, তন্ত্র, পুঁথি, কাব্য প্রচলিত থাকল। সাথে যুক্ত হলো সংস্কৃত ভাষায় আর্যদের নানা বৈদিক মন্ত্র ও ধর্মগ্রন্থ। মূর্তি তৈরি ও এর সাজসজ্জা, অলঙ্করণ, পট নির্মাণ ইত্যাদি চারুকলার চর্চা যেমন রয়েছে তেমনি আরাধনা, আরতি, হোমযজ্ঞ মিলে গানবাজনার চর্চাও বেশ অপ্রতিহত থাকল। হিন্দু ধর্মীয় অনুষ্ঠানে নৃত্যেরও স্থান রয়েছে।

তবে হিন্দু ধর্মের বর্ণপ্রথার কড়াকড়ির জন্যে নিম্নবর্ণের মানুষ ইসলামের সাম্যের বাণীতে আকৃষ্ট হয়েছে। সুফিসাধকরাই প্রধানত এদেশে ইসলাম ধর্ম প্রচার করেছেন। মধ্যযুগে ইরান, তুরান, আফগান থেকে আসা ভাগ্যান্বেষী মানুষের মাধ্যমেও মুসলিম সমাজের প্রসার ঘটেছে।

কালে কালে এদেশে বিশাল এক মুসলিম সম্প্রদায় তৈরি হয়েছে। তবে প্রাচীন কৃষিভিত্তিক গ্রামীণ সমাজের ধারাবাহিকতায় হিন্দু-মুসলিম এদেশে পাশাপাশি শান্তিতে বসবাস করে আসছে। তাদের সংস্কৃতিতে ধর্মের ভিত্তিতে বাউল-গানসহ লোকগানে আর নকশিকাঁথাসহ অধিকাংশ লোকশিল্পে উভয় সম্প্রদায়ের মানুষের অবদান রয়েছে। ধর্মের ভিত্তিতে হিন্দু-মুসলমান যেমন পার্থক্য রয়েছে, তেমনি আবার আবহাওয়া ও ভাষাগত কারণে বাংলার মুসলমান ও আরবের মুসলমানের মধ্যে অনেক পার্থক্য রয়েছে।

বাংলাদেশে বৌদ্ধ সম্প্রদায় ছোট। গৌতম বুদ্ধের জীবনকে ঘিরে বৈশাখী পূর্ণিমায় তাঁরা উৎসবমুখর অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে। এদেশের খ্রিষ্টান সম্প্রদায় আরও ছোট। তাঁরা নিজেদের নানা ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও পার্বণ উদযাপন করে থাকেন। বড়দিন বা যিশুখ্রিষ্টের জন্মদিনে অবশ্য বড় অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। এতে অন্যান্য সম্প্রদায়ও আমন্ত্রিত হয়। দেশের ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মানুষও নানা ধর্মীয় ও সামাজিক উৎসবে মেতে উঠেন। নববর্ষে, বসন্তে, বিয়েতে আনন্দময় উৎসবের আয়োজন করেন তাঁরা।

এইসব পার্থক্যকে অতিক্রম করে মানবিক মূল্যবোধে সব ধর্মের, সব ভাষার, সব পেশার সব দেশের মানুষ শান্তিতে-সম্প্রীতিতে বাস করতে পারে। এটা সব ধর্মেরই মূল শিক্ষা। আর বাংলার সাধারণ মানুষ আজীবন সেই জীবনসাধনাই করেছে।

অনুশীলনমূলক কাজ

কাজ- ১ : ধর্ম আমাদের সংস্কৃতি ও জীবনযাপনে কী ধরনের প্রভাব ফেলেছে?

কাজ- ২ : এদেশে বসবাসকারী নানা মানুষের নানা ধর্মের মূল শিক্ষা কী?

পাঠ-৪ : উৎসব ও মেলা

বাংলায় প্রবাদ আছে বারো মাসে তের পার্বণ। অর্থাৎ এখানে ঘন ঘন উৎসব-অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। ধর্মীয় উৎসব তো আছেই। এর বাইরে নবান্ন, নববর্ষ উদযাপিত হয়ে থাকে। আর আছে নানা উপলক্ষে অসংখ্য মেলা। বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির-শিল্প সংস্থার এক জরিপে জানা যাচ্ছে সারাদেশে বছরে ১০০৫টি মেলা হয়। এসব মেলার নব্বই ভাগই গ্রামীণ মেলা। মুসলমান, হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান, এমনকি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীসহ সকল সম্প্রদায়ই মেলার আয়োজন করে থাকেন। তা বলে এক ধর্মের মেলায় অন্য ধর্মের লোক যায় না তা নয়। সবাই সবার মেলায় বিকিকিনি করতে যায়। কোনো কোনো মেলা আবার সবাই মিলে সামাজিকভাবে আয়োজন করে থাকে। মেলায় কেবল যে ঘরসংসারের আর শখের জিনিসের বিকিকিনি হয় তা নয়। প্রায় সব মেলাতেই যাত্রা, থিয়েটার, পাঁচালি, কবিগান, কীর্তন, বাউলগানের আয়োজন থাকে, অনেক মেলাতে নাগরদোলা, ম্যাজিক, লাঠিখেলা, কুস্তি, পুতুলনাচ, বায়োস্কোপ ইত্যাদিও থাকে।

মেলা

ইদানীং সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে নানা রকম বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিক মেলাও হচ্ছে, যেমন–বস্ত্রমেলা, আবাসন মেলা, বিজয় মেলা, বৈশাখী মেলা ইত্যাদি। একুশে ফেব্রুয়ারিকে কেন্দ্র করে বাংলা একাডেমি আয়োজন করে থাকে মাসব্যাপী একুশের বইমেলা। এ মেলাকে কেন্দ্র করেই মূলত বাংলাদেশের সৃজনশীল গ্রন্থ প্রকাশনা হয়ে থাকে। তাই বাঙালির সাংস্কৃতিক জীবন ও সাহিত্যসাধনায় একুশের বিশাল অবদান অস্বীকার করা যাবে না। ইদানীং দেশের বিভিন্ন জেলাশহরেও একুশে উদযাপনের সাথে সাথে বইমেলাও আয়োজিত হচ্ছে। বাংলাদেশে মেলার ক্ষেত্রে আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে বরেণ্য মনীষীদের স্মরণে মেলার আয়োজন– কুষ্টিয়ার লালনমেলা, শিলাইদহের রবীন্দ্রমেলা, দরিরামপুরের নজরুল মেলা, সাগরদাড়ির মধুমেলা, সুনামগঞ্জের হাসনমেলা, অম্বিকাপুরের জসীমমেলা অন্যতম।

একুশের বইমেলা

সোনার বাংলার কথা

আমাদের জমি উর্বর। আমাদের প্রকৃতির দাক্ষিণ্য অসীম। আমাদের সংস্কৃতি নানা বৈচিত্র্যে সমৃদ্ধ। আমাদের মানুষ স্বভাবতই সরল ও স্বল্পে তুষ্ট। তারা হাজার বছর ধরে যে সংস্কৃতি তৈরি করেছে তার মর্মকথা হলো মানুষে মানুষে ভেদাভেদ নেই। বাঙালি সাধক স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন– জীবে প্রেম করে যেজন সেজন সেবিছে ঈশ্বর। আর বাঙালি কবি শেখ ফজলল করিম বলেছেন– কোথায় স্বর্গ কোথায় নরক কে বলে তা বহুদূর/মানুষের মাঝে স্বর্গ নরক, মানুষেতে সুরাসুর।

অনুশীলনমূলক কাজ

কাজ- ১ : তোমার দেখা একটি মেলার বর্ণনা দাও।

কাজ- ২ : কয়েকটি দলে ভাগ হয়ে মেলা নিয়ে মুক্ত আলোচনা করে প্রত্যেক দল থেকে ভিন্ন রকমের মেলার পরিকল্পনা তৈরি কর।

কাজ- ৩ : বাঙালি সংস্কৃতি অসাম্প্রদায়িক ও মানবিক– এ কথার সমর্থনে দুয়েকটি মেলার নাম বল।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. নবান্ন উৎসব হয় কোন ঋতুতে ?

ক. বর্ষা খ. শরৎ
গ. হেমন্ত ঘ. শীত

২. বাংলাদেশের সংস্কৃতিতে বৈচিত্র্য রয়েছে, কারণ–

i. বাঙালি সংকর জাতি
ii. এ দেশের ঋতু বৈচিত্র্যপূর্ণ
iii. বিভিন্ন ভাষাভাষি লোকজনের অবস্থান

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i খ. ii
গ. i ও ii ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও–

ঝুমার দাদা নদীর তীরে দাঁড়িয়ে স্মৃতিচারণ করছিলেন। নদীর উত্তর দিকে তাদের বাড়ি ছিল। বাড়ির পাশেই ছিল একটি মসজিদ। গোয়াল ঘরটি ছিল বাড়ির পিছনে। সে সময়ে মতি মাঝি ঐ নদীর উপর দিয়ে মনের খুশিতে ভাটিয়ালি গান গেয়ে যেত।

৩. উদ্দীপকে বাংলাদেশের কোন দুর্যোগকে ইংগিত করা হয়েছে ?

ক. জলোচ্ছ্বাস খ. নদী ভাঙ্গন
গ. অনাবৃষ্টি ঘ. বন্যা

৪. উক্ত প্রাকৃতিক দুর্যোগ সত্ত্বেও মতি মিয়ার মতো এদেশের মানুষের খুশি হবার প্রধান কারণ–

i. জলবায়ুর বিশেষ প্রভাব
ii. নদনদীর বিপুল সম্পদ
iii. দেশের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য

নিচের কোনটি সঠিক ?

ক. i ও ii খ. ii ও iii
গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. রমজান আলীর জন্মদিনে তার তিন বন্ধু পিটার গোমেজ, অপর্ণা বিশ্বাস ও সুশীল বড়ুয়া বিশাল একটি ফুলের তোড়া নিয়ে আসেন। দীর্ঘ নয় বছরের বন্ধুত্ব তাদের। এ সময়ে ঝগড়াতো দূরের কথা, কেউ কাউকে না দেখলে একটা দিনও থাকতে পারে নি। ঈদুল ফিতর, দুর্গাপূজা, বৌদ্ধ পূর্ণিমা, বড়দিন ইত্যাদি উৎসবে তারা একে অপরের সাথে দেখা সাক্ষাৎ ও ভাববিনিময় করেন।

ক. কাজী নজরুল ইসলাম স্মরণে বাংলাদেশের কোথায় মেলা অনুষ্ঠিত হয়?

খ. বাংলাদেশের কৃষি প্রধানত কীসের উপর নির্ভরশীল? ব্যাখ্যা কর।

গ. সংস্কৃতি সংরক্ষণে উদ্দীপকে কোন বিষয়ের প্রভাব ফুটিয়ে তোলা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'ধর্মীয়ভাবে একে অপর থেকে আলাদা হলেও তাদের মূল্যবোধ একই উদ্দীপকের আলোকে বিষয়টি মূল্যায়ন কর।

২. বাংলা প্রথম মাসের প্রথম দিন। ফারিবা, রাইসা, রুপন্তি, প্রিয়তী সকলে মিলে ঠিক করে তারা রমনা বটমূলে যাবে। সকলে লাল-সাদা রঙের শাড়ি পরবে। সেখানে উৎসবের গান ও কবিতা শুনবে। প্রতি বছরই এখানে অনেক নারীপুরুষ আসে। এরা মুখোশ পরে, গান গায়, অনেকে আবার মুখে বিভিন্ন ছবি আঁকে।

ক. বাংলার মানুষের প্রধান জীবিকা কী?

খ. সব ধর্মের মূল শিক্ষা কোনটি? ব্যাখ্যা কর।

গ. উদ্দীপকে বাংলার কোন মেলাকে ইংগিত করা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য বিকাশে উদ্দীপকের বর্ণিত মেলার ভূমিকা মূল্যায়ন কর।

অধ্যায়-চার
অর্থনীতি

পাঠ-১ ও ২ : বাংলাদেশের অর্থনীতি

বাংলাদেশ একটি কৃষিপ্রধান দেশ। এদেশের বেশির ভাগ মানুষ গ্রামে বাস করে। আর কৃষিই তাদের জীবিকার প্রধান উপায়। তবে শহরাঞ্চলের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে শিল্প ও বাণিজ্যের ভূমিকাও আমাদের অর্থনীতিতে ক্রমে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। একটি আধুনিক রাষ্ট্রে কৃষি, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য কোনো খাতের গুরুত্ব অন্য খাত থেকে কম নয়। দেশকে উন্নত করতে হলে আমাদের জাতীয় অর্থনীতিকে সব দিক থেকে সবল ও গতিশীল করে তুলতে হবে। তার জন্য কৃষি, শিল্প, ব্যবসা-বাণিজ্য সবক্ষেত্রেই আমাদের উন্নতি করতে হবে। বর্তমান প্রতিযোগিতাপূর্ণ বিশ্বে এর কোনো বিকল্প নেই।

নানা অর্থনৈতিক কার্যক্রম

অর্থনৈতিক মূল্য রয়েছে এমন যে-কোনো কাজ, সেবা বা বিনিময়কে অর্থনৈতিক কার্যক্রম বলা হয়। আর যে-কোনো দেশের অর্থনৈতিক কার্যক্রমকে অনানুষ্ঠানিক ও আনুষ্ঠানিক এই দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। যে-সব কাজের জন্য মজুরি নির্ধারিত নেই, করের আওতায় আনাও কঠিন এবং যে-সব অর্থনৈতিক কার্যক্রম সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয় না, সংক্ষেপে অনানুষ্ঠানিক কার্যক্রম বলতে সেগুলোকেই বোঝায়। যেমন : নিজের জমি, দোকান বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে কাজ, গৃহস্থালি কর্ম, হকারি, দিনমজুরি প্রভৃতি। অনুন্নত বা উন্নয়নশীল দেশের বেশির ভাগ অর্থনৈতিক কার্যক্রম এই অনানুষ্ঠানিক খাতের মাধ্যমেই হয়ে থাকে। অতীতকাল থেকে চলে আসছে বলে অনেকে এসব কাজকে অর্থনীতির প্রথাগত খাতও বলে থাকেন।

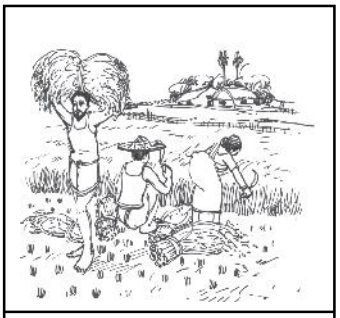

কৃষিকাজ

হকার

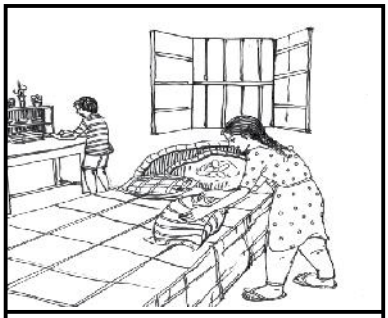

গৃহস্থলি কাজ

গ্রামাঞ্চলের অনানুষ্ঠানিক অর্থনৈতিক কাজ

বিশ্বের অন্য যে-কোনো উন্নয়নশীল দেশের মতো বাংলাদেশের অর্থনীতিতেও অনানুষ্ঠানিক খাত প্রধান ভূমিকা পালন করছে। গ্রামের একজন চাষি ও তার পরিবারের সদস্যরা সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত জমিতে কাজ করেন। নিজেদের জমিতে কাজ করার জন্য তারা কোনো মজুরি পান না বা নেন না।

কিন্তু তাদের সে কাজ বা পরিশ্রমের ফলে কেবল তাদের পরিবারই নয়, সমাজ ও রাষ্ট্রও উপকৃত হচ্ছে। দেশের মোট খাদ্য চাহিদার বড় অংশটা তারাই উৎপাদন করছে। এভাবে আমাদের কৃষকরা জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। কামার-কুমোরের কাজ, গ্রামের কুটির শিল্প, দোকান ও অন্যান্য ছোটখাটো ব্যবসাও অনানুষ্ঠানিক অর্থনৈতিক কাজের অন্তর্ভুক্ত। আমাদের অর্থনীতিকে সচল রাখতে এসব কাজও মূল্যবান ভূমিকা পালন করছে। সাম্প্রতিককালে কৃষিসহ গ্রামীণ অর্থনীতিতে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার লক্ষ করা গেলেও, প্রথাগত বা অনানুষ্ঠানিক খাতটি এখনও প্রধান ভূমিকায় রয়েছে। জাতীয় অর্থনীতির দিক থেকে বিবেচনা করলেও এই খাতটি গুরুত্বপূর্ণ সহায়ক ভূমিকা পালন করছে।

শহরাঞ্চলের অনানুষ্ঠানিক অর্থনৈতিক কাজ

বাংলাদেশের শহরগুলোতে উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত ও বিত্তহীন সকল শ্রেণির মানুষই বাস করে। বিত্তহীনদের মধ্যে অনেকে আবার ভাসমান বা অস্থায়ী। অর্থাৎ তাদের নিজস্ব বা স্থায়ী বাসাবাড়ি নেই। তারা বস্তি, ফুটপাত, পার্ক, রেলস্টেশন ইত্যাদিতে বাস করে। উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণির লোকেরা সাধারণত আনুষ্ঠানিক অর্থনৈতিক কাজ যেমন সরকারি ও বেসরকারি চাকুরি, ব্যবসা-বাণিজ্য ইত্যাদিতে নিয়োজিত। নিম্নবিত্ত ও বিত্তহীনরা ছোটখাটো দোকান, ফুটপাতে হকারি, ফেরিওয়ালা, রিকশা বা ঠেলাগাড়ি চালক, মুটে, মিস্ত্রি, যোগালি, কিংবা বাসাবাড়ির কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে। এগুলোকে অনানুষ্ঠানিক অর্থনৈতিক কাজ বলে গণ্য করা হয়।

অর্থনীতিতে অনানুষ্ঠানিক খাতের অবদান

গ্রামপ্রধান বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে বসবাসকারী বেশির ভাগ মানুষ নিজস্ব উদ্যোগে ও শ্রমে ধান-পাট, রবিশস্য, শাকসবজি ও ফলমূল উৎপাদন, মাছ ধরা, গরু-ছাগল ও হাঁস-মুরগি পালন, কুটিরশিল্প, হাটবাজারে পণ্য বিক্রি করার মাধ্যমে তাদের জীবিকার সংস্থানই করছে। শুধু তাই নয়, তারা দেশের অর্থনৈতিক জীবনকে সচল রাখার ক্ষেত্রেও প্রধান ভূমিকা পালন করছে। একইভাবে শহরাঞ্চলে বসবাসকারী স্বল্প ও মাঝারি এমন কি উচ্চ আয়ের অনেক মানুষও অনানুষ্ঠানিক খাতের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নিজেদের নিয়োজিত রেখেছে। এভাবে প্রথম থেকেই বাংলাদেশের অর্থনীতি অনানুষ্ঠানিক খাতের উপর বেশি নির্ভরশীল। সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে আনুষ্ঠানিক খাতের ভূমিকা বৃদ্ধি ও তা জোরদার হওয়ার পরও আমাদের অর্থনীতিতে প্রথাগত বা অনানুষ্ঠানিক খাতের গুরুত্ব কমেনি।

অনুশীলনমূলক কাজ

কাজ-১ : তোমার এলাকার যে-কোনো একটি অনানুষ্ঠানিক অর্থনৈতিক কাজের বিবরণ দাও। জাতীয় অর্থনীতিতে তা কীভাবে অবদান রাখে বুঝিয়ে বল।

কাজ-২ : আনুষ্ঠানিক অর্থনৈতিক কাজ বলতে আমরা কোনগুলিকে বুঝি? আমাদের জাতীয় অর্থনীতিতে সেগুলোর গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর।

পাঠ-৩ ও ৪ : বাংলাদেশের অর্থনীতিতে শিল্পের ভূমিকা

বাংলাদেশ একটি কৃষিপ্রধান দেশ হলেও ব্রিটিশ আমল থেকেই এখানে কিছু কিছু শিল্প বা কলকারখানা গড়ে উঠতে থাকে। তার মধ্যে পাট, সুতা ও কাপড়ের কলই ছিল প্রধান। পাকিস্তান সৃষ্টির পর পূর্ব-বাংলার নারায়ণগঞ্জে প্রতিষ্ঠিত হয় পৃথিবীর সর্ববৃহৎ পাটকল আদমজি জুট মিল্‌স। পাকিস্তানি আমলে শিল্প বা কলকারখানা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এ-অঞ্চলটি পাকিস্তানি শাসকদের বৈষম্য বা বঞ্চনার শিকার হয়। ১৯৭১-এ স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে নতুন নতুন শিল্পকারখানা গড়ে উঠতে শুরু করে। এক সময় আমাদের দেশের পাটশিল্পই ছিল প্রধান, সেই সঙ্গে ছিল চা, চিনি, সিমেন্ট, সার, চামড়া, রেল ও ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা। বর্তমানে গার্মেন্টস ও ঔষধ শিল্পেও বাংলাদেশ বিরাট সাফল্য অর্জন করেছে। আকার, মূলধন, উৎপাদনের পরিমাণ, কর্মী বা শ্রমিকের সংখ্যা ইত্যাদি বিচারে শিল্প প্রতিষ্ঠানকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায় :

গার্মেন্টস কারখানা

বৃহৎ শিল্প

পাট, বস্ত্র, চিনি, সিমেন্ট, সার, রেল, ইঞ্জিনিয়ারিং, বিদ্যুৎ প্রভৃতি বৃহৎ শিল্প। এসব শিল্প প্রতিষ্ঠানে প্রচুর মূলধন, দক্ষ শ্রমিক ও কারিগর, প্রকৌশলী, বিশেষজ্ঞ ও অভিজ্ঞ ব্যবস্থাপকের প্রয়োজন হয়।

এসব শিল্পের উৎপাদন ক্ষমতাও অনেক বেশি। দেশের চাহিদা মিটিয়েও উৎপাদিত সামগ্রীর একটা অংশ বিদেশে রপ্তানি হয়। জাতীয় অর্থনীতিতে এ ধরনের বৃহৎ শিল্পের গুরুত্ব তাই অত্যধিক। দেশের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড হিসেবে কাজ করে এই শিল্পগুলো।

ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা

মাঝারি শিল্প

যেসব শিল্প প্রতিষ্ঠানে দেড় কোটি টাকার অধিক মূলধন খাটে সেগুলোকে সাধারণত মাঝারি শিল্প বলে গণ্য করা হয়। যেমন– হাল্কা ইঞ্জিনিয়ারিং, সিল্ক, সিরামিক, কোল্ডস্টোরেজ বা হিমাগার প্রভৃতি। দেশের চাহিদা পূরণ ও অনেক লোকের কর্মসংস্থানের মাধ্যমে এ ধরনের শিল্প জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ক্ষুদ্র শিল্প

দেড় কোটি টাকার কম মূলধন খাটে যে কারখানা বা শিল্প প্রতিষ্ঠানে তাকে ক্ষুদ্র শিল্প ধরা হয়। চাল কল, ছোট ছোট জুতা বা প্লাস্টিক কারখানা, খাদ্য প্রক্রিয়াজাত শিল্প এর উদাহরণ।

কুটিরশিল্প

কুটিরশিল্প

এই শিল্পে উৎপাদন ও বিপণনের কাজটি প্রধানত মালিক নিজে বা তার পরিবারের সদস্যরাই করে থাকেন। আমাদের দেশে তাঁতবস্ত্র, মাটির তৈরি জিনিসপত্র, বাঁশ, বেত ও কাঠের কাজ, শাড়ি বা মিষ্টির প্যাকেট, আগরবাতি ইত্যাদি কুটিরশিল্পের কয়েকটি উদাহরণ। বাংলাদেশের মতো বৃহৎ জনসংখ্যার ও শিল্পে অনগ্রসর একটি দেশে অসংখ্য মানুষের কর্মসংস্থান ও স্বনির্ভরতা অর্জনের সুযোগ করে দিয়ে কুটিরশিল্প জাতীয় অর্থনীতিতে মূল্যবান অবদান রাখছে।

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে শিল্পের অবদান

নগরের বিস্তার ও মানুষের জীবনমান বৃদ্ধির ফলে পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও শিল্পের ভূমিকা ক্রমে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। খাদ্য, বস্ত্র, ঔষধের মতো জিনিসগুলো তো বটেই; জ্বালানি, বিদ্যুৎ, গৃহনির্মাণ সামগ্রী ছাড়া আমাদের জীবন আজ অচল। আর এগুলো আমরা পাই কোনো না কোনো শিল্প থেকে। কৃষির পর দেশের বিরাটসংখ্যক মানুষের জীবিকার সংস্থানও হচ্ছে এই শিল্পখাত থেকেই। এর অভাবে দেশে বেকারত্বের হার আরও বাড়ত। সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশে গার্মেন্টস শিল্পের বিস্তার লক্ষ লক্ষ মানুষ বিশেষ করে নারীদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দিয়েছে। এটি দেশের সামাজিক অগ্রগতিতেও ভূমিকা রাখছে। শিল্পখাতে কর্মসংস্থানের সুযোগ মানুষকে শিক্ষা ও প্রযুক্তির প্রতি আগ্রহী করে তুলছে। আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার দেশের গণ্ডি ছাড়িয়ে আমাদের বিশ্বনাগরিক হিসেবে ভাবতে উদ্বুদ্ধ করছে।

বাংলাদেশে শিল্পের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা

বাংলাদেশ একটি শিল্প সম্ভাবনাময় দেশ। এর রয়েছে বিশাল জনসম্পদ। এখানে অপেক্ষাকৃত কম মজুরিতে দক্ষ ও অদক্ষ উভয় ধরনের প্রচুর শ্রমিক পাওয়া যায়। ফলে বিদেশি বিনিয়োগকারীরা এদেশে শিল্প স্থাপন ও বিনিয়োগ করতে আগ্রহী হন। গার্মেন্টস শিল্প এর একটি বড় উদাহরণ। বিভিন্ন বিদেশি কোম্পানি বাংলাদেশে এককভাবে ও এদেশীয়দের সঙ্গে যৌথ অংশীদারিত্বে গার্মেন্টস কারখানা স্থাপন করেছে। এদেশে উৎপাদিত পোশাক আজ বিশ্বের বাজারে সমাদৃত হচ্ছে। গার্মেন্টস ছাড়াও অন্যান্য শিল্পেও বিদেশিরা পুঁজি বিনিয়োগ করতে আগ্রহ দেখাচ্ছেন। বিদেশি বিনিয়োগকারীদের আকৃষ্ট করতে সরকার দেশে কয়েকটি রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা প্রতিষ্ঠা করেছে। তাছাড়া বন্দর ও পরিবহন সুবিধা বৃদ্ধি, বিদ্যুৎ ও গ্যাস সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নতি, ওয়ান স্টেপ সেবা চালু করার মাধ্যমেও সরকার শিল্পখাতে বিদেশি বিনিয়োগকে উৎসাহিত করছে। এসব পদক্ষেপের ফলে আগামীতে দেশে নানা ধরনের শিল্পকারখানা গড়ে উঠার সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে। ইদানীং বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশিদেরও অনেকে তাদের অর্জিত অর্থ দেশে শিল্প প্রতিষ্ঠায় বিনিয়োগ করতে আগ্রহ দেখাচ্ছেন। এভাবে বাংলাদেশের একটি শিল্পসমৃদ্ধ মধ্য আয়ের দেশ হওয়ার সম্ভাবনা ক্রমে উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। এর ফলে শুধু যে দেশে দারিদ্র্য হ্রাস ও বেকার সমস্যারই সমাধান হবে তাই নয়, সাধারণভাবে মানুষের আর্থিক অবস্থার উন্নতি এবং জাতীয় অর্থনীতিও শক্তিশালী হবে।

অনুশীলনমূলক কাজ

কাজ-১ : ক্ষুদ্র, মাঝারি, বৃহৎ কিংবা কুটিরশিল্প– এর যে কোনো এক ধরনের শিল্পের নামোল্লেখ করে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে তার গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর।

কাজ-২ : বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ শিল্প সম্ভাবনা সম্পর্কে সংক্ষেপে লেখ।

পাঠ-৫ : বাংলাদেশের আমদানি ও রপ্তানি

আমদানি ও রপ্তানি

সাধারণত কোনো দেশই তার চাহিদার সমস্ত জিনিস নিজেরা উৎপাদন করতে পারে না। অন্য দেশ থেকে কিছু কিছু জিনিস তাকে আমদানি করতে হয়। একইভাবে দেশের চাহিদা মিটিয়ে উৎপাদিত সামগ্রীর একটা অংশ বিদেশে রপ্তানি করা হয়। যে দেশে যে সামগ্রী প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয় সাধারণত সেগুলোই বিদেশে রপ্তানি করা হয়। এভাবে বিদেশে পণ্য রপ্তানি করে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা যেমন বিদেশ থেকে পণ্য আমদানিতে ব্যয় হয় তেমনি দেশের উন্নয়নেও কাজে লাগে। এই যে বিদেশ থেকে পণ্য আমদানি ও বিদেশে পণ্য রপ্তানি, এর নামই বৈদেশিক বাণিজ্য। যে কোনো দেশের অর্থনীতিতে বৈদেশিক বাণিজ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। আধুনিক বিশ্বে এই বৈদেশিক বাণিজ্যের সুযোগ অনেক বেড়েছে। কোনো দেশই আজ তার চাহিদার সমস্ত জিনিষ নিজেরা উৎপাদন করার কথা ভাবে না। বরং দেশের অর্থনীতির কথা বিবেচনা করে যে পণ্যটা আমদানি বা রপ্তানি করা সহজ ও লাভজনক, তাই করা হয়। একটি পরিকল্পনা ও নীতির আওতায় কাজটা করা হয়। বিভিন্ন দেশের মধ্যে পারস্পরিক চুক্তির আওতায় এই আমদানি-রপ্তানি অর্থাৎ বৈদেশিক বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালিত হয়। আর এই বাণিজ্যিক কার্যক্রম তদারকি, নিয়ন্ত্রণ ও বাণিজ্য শুল্ক নির্ধারণ ইত্যাদি বিষয়গুলো দেখার জন্য রয়েছে কতগুলো আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংস্থা বা সংগঠন। যেমন বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (World Trade Organisation : WTO), দক্ষিণ এশীয় মুক্ত বাণিজ্য এলাকা (South Asian Free Trade Area : SAFTA) প্রভৃতি। বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে যে দেশের আমদানির চেয়ে রপ্তানির পরিমাণ বেশি তাকে উন্নত দেশ ধরা হয়।

বাংলাদেশের আমদানি পণ্যসামগ্রী

বাংলাদেশ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে নিয়মিত যেসব পণ্য আমদানি করে সেগুলো হলো চাল, গম, ডাল, তৈলবীজ, তুলা, অপরিশোধিত পেট্রোল ও পেট্রোলিয়ামজাত দ্রব্য, ভোজ্যতেল, সার, কৃষি ও শিল্প যন্ত্রপাতি, সুতা প্রভৃতি। আর যেসব দেশ থেকে এসব সামগ্রী আমদানি করা হয় তার মধ্যে রয়েছে চীন, ভারত, জাপান, সিঙ্গাপুর, দক্ষিণ কোরিয়া, মালয়েশিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স ও জার্মানি। সরকারি ও বেসরকারি উভয় খাতেই এই আমদানি বাণিজ্য চলে। বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসেব অনুযায়ী গত ২০০৯-২০১০ অর্থবছরে বাংলাদেশ বিদেশ থেকে প্রায় ১ কোটি ৭২ লক্ষ মার্কিন ডলারের পণ্যসামগ্রী আমদানি করেছে। ২০১১-১২ অর্থবছরে বাংলাদেশের আমদানি ব্যয় ২৬ হাজার নয়শত ৪৬ (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)। এই পরিমাণ আগের দুই অর্থবছরের চেয়ে কম। অর্থাৎ আমদানি খাতে বাংলাদেশের অর্থব্যয় কমে আসছে।

বাংলাদেশের রপ্তানি পণ্যসামগ্রী

এক সময় পাটই ছিল আমাদের প্রধান রপ্তানি সামগ্রী। পাট ও পাটজাত দ্রব্য যেমন– চটের ব্যাগ, কার্পেট প্রভৃতি রপ্তানি করে বাংলাদেশ প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন করত। কিন্তু মাঝের কয়েক বছর সারা বিশ্বে পাট ও পাটজাত দ্রব্যের চাহিদা কমে যায়। সম্প্রতি বাংলাদেশি বিজ্ঞানীদের দ্বারা পাটের 'জেনোম' বা জন্মরহস্য আবিষ্কার এবং বিশ্বব্যাপী পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধির ফলে আবারও পাট ও

পাটজাত সামগ্রী রপ্তানিতে বাংলাদেশের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। কাঁচা পাট ও পাটজাত দ্রব্য ছাড়া আরও যেসব পণ্য বাংলাদেশ বিদেশে রপ্তানি করে থাকে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো চা, চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্য, তৈরি পোশাক, হিমায়িত চিংড়ি ও অন্যান্য খাদ্য, হস্তশিল্পজাত দ্রব্য, সবজি প্রভৃতি। বাংলাদেশ ব্যাংকের হিসেব অনুযায়ী গত ২০০৯-২০১০ অর্থবছরে বাংলাদেশ তৈরি পোশাকসহ অন্যান্য সামগ্রী রপ্তানি করে প্রায় ১ হাজার একশো ৫৪ কোটি মার্কিন ডলার উপার্জন করেছে। ২০১১-১২ অর্থবছরে রপ্তানি আয় ১৭ হাজার ৮ শত ৮৬ (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)। পোশাকসহ বাংলাদেশের পণ্যসামগ্রীর সবচেয়ে বড় ক্রেতা হলো যুক্তরাষ্ট্র। এর পরের সারিতে আছে জার্মানি, যুক্তরাজ্য ও ফ্রান্স।

আমদানি ও রপ্তানির গুরুত্ব

বাংলাদেশ বিদেশ থেকে প্রধানত সেসব পণ্যই আমদানি করে যা দেশের মানুষের খাদ্য ও অন্যান্য চাহিদা পূরণের জন্য দরকার। সময় মতো এসব পণ্য আমদানি না করতে পারলে স্বাভাবিকভাবেই দেশে এসব পণ্যের চরম অভাব ও মূল্যবৃদ্ধি ঘটত। আর তাতে দেশে সামাজিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতা দেখা দিত। পৃথিবীর কোনো দেশই তার চাহিদার সমস্ত সামগ্রী নিজ দেশে উৎপাদন করে না। পরিকল্পিত বাণিজ্য নীতির আওতায় অন্য দেশ থেকে সুবিধাজনক দামে আমদানি করে। বাংলাদেশও তার ব্যতিক্রম নয়। তবে এরই পাশাপাশি বাংলাদেশ বেশ কিছু পণ্য নিয়মিত বিদেশে রপ্তানি করছে। তা থেকে মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জন করছে। দেশের অর্থনীতিকে সচল রাখতেই তা যে সাহায্য করছে শুধু তাই নয়, এর ফলে দেশে শিল্প সম্প্রসারণ ও কর্মসংস্থানেরও সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। আমদানি হ্রাস করে রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধির মাধ্যমে আমরা জাতি হিসেবে স্বাবলম্বী হয়ে উঠতে পারি। জনগণকে যত বেশি আমরা উৎপাদনের কাজে নিয়োজিত করতে পারব ততই অর্থনৈতিকভাবে স্বনির্ভর হয়ে উঠব। বাংলাদেশকে একটি মধ্য আয়ের শিল্প সম্ভাবনাময় দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে হলে বৈদেশিক বাণিজ্য বিশেষ করে রপ্তানির বিষয়টিকে আমাদের গুরুত্ব দিতে হবে।

অনুশীলনমূলক কাজ

কাজ-১ : বাংলাদেশের আমদানি ও রপ্তানি পণ্যের একটি তালিকা তৈরি কর।

কাজ-২ : আমদানি ও রপ্তানির গুরুত্ব সম্পর্কে কয়েকটি বাক্য লেখ।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কোন দেশটি পোশাকসহ বাংলাদেশে উৎপাদিত পণ্য সামগ্রীর সবচেয়ে বড় ক্রেতা ?

ক. ফ্রান্স খ. জার্মানি

গ. যুক্তরাষ্ট্র ঘ. যুক্তরাজ্য

২. বাংলাদেশ একটি শিল্প সম্ভাবনাময় দেশ কারণ, এখানে--

i . কম মজুরিতে শ্রমিক পাওয়া যায়

ii. বিনিয়োগ সহায়ক সরকারি কর্মসূচি রয়েছে

iii. উৎপাদিত পণ্যের গুণাগুণ অন্য দেশের চেয়ে ভালো

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

রাকিব সাহেব একজন শিল্পপতি। তিনি ঢাকার তেঁজগাও এলাকায় ৩০ লাখ টাকা দিয়ে একটি পোশাক তৈরির কারখানা স্থাপন করেন। তার এ কারখানাটিতে ২০০ জন শ্রমিক কাজ করে। তিনি এ কারখানার লভ্যাংশ দিয়ে আরও একটি কারখানা স্থাপন করেন। তৈরিকৃত পোশাক তিনি ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করেন।

৩. রাকিব সাহেবের স্থাপিত কারখানাটি কোন শিল্পের অন্তর্গত ?

ক. কুটির শিল্প খ. ক্ষুদ্রশিল্প

গ. মাঝারি শিল্প ঘ. বৃহৎ শিল্প

৪. উক্ত কাজটি বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনীতির কোন ক্ষেত্রে সর্বাধিক প্রভাব ফেলছে ?

ক. দেশীয় কাঁচামালের সদ্ব্যবহার খ. স্বনির্ভরতা অর্জন

গ. কর্মসংস্থান সৃষ্টি ঘ. মূলধন বৃদ্ধি

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. তমিজ উদ্দিন তার তিন ছেলেকে সাথে নিয়ে তার জমিতে ধান, গম, সরিষা, ভুট্টাসহ নানা ধরনের ফসল চাষ করে। তার স্ত্রী ও পুত্রবধুরাও ফসল তোলার কাজে সহায়তা করে। অবসর সময়ে সে বাড়ির সামনে একটি মুদি দোকান চালায়। কিন্তু এসব কাজের জন্য কেউ তাকে কোনো বেতন দেয় না। তাতে সে মনে কষ্ট না পেয়ে বরং গর্ববোধ করে।

ক. SAFTA এর পুরো নাম কী?

খ. মাঝারি শিল্প বলতে কী বোঝায় ? ব্যাখ্যা কর।

গ. তমিজ উদ্দিনের পরিবারের সদস্যদের কাজ কোন ধরনের অর্থনৈতিক কাজের আওতাভুক্ত তা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. তমিজ উদ্দিনের মতো মানুষের কাজ জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে-- মূল্যায়ন কর।

২. জরিনা বেগম গ্রামের একজন গরিব বিধবা মহিলা। সে একদিন বাজার থেকে বাঁশ ও বেত কিনে নিয়ে আসে। দুই মেয়েকে নিয়ে ডালা, কুলা ও ফুলদানি তৈরি করে। তার ছেলে তামজিদ এগুলো বাজারে বিক্রি করে। এতে তাদের যে লাভ হয় তা দিয়ে সংসার চলে। দিনে দিনে তাদের তৈরিকৃত দ্রব্যের চাহিদা বাড়তে থাকে। পরবর্তীতে তামজিদ তার বাবার এক বন্ধুর সহযোগিতায় স্থানীয় একটি ব্যাংক থেকে ঋণ নেয়। সে কেক, বিস্কুটসহ বিভিন্ন খাদ্য দ্রব্য তৈরির কারখানা স্থাপন করে। তামজিদ তার কারখানায় খাদ্যদ্রব্য প্রক্রিয়াজাত এবং প্যাকেটজাত করে বাজারে বিক্রি করে প্রচুর লাভ করে।

ক. রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য কি ?

খ. অনানুষ্ঠানিক অর্থনৈতিক কার্যক্রম বলতে কী বোঝায় ? ব্যাখ্যা কর।

গ. তামজিদের স্থাপিত কারখানাটি কোন শিল্পের অন্তর্গত তা ব্যাখ্যা কর।

ঘ. বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে জরিনা বেগমের কাজের অবদান মূল্যায়ন কর।

অধ্যায়-পাঁচ

বাংলাদেশের নির্বাচন ব্যবস্থা

আধুনিক গণতন্ত্রের অন্যতম ভিত্তিই হলো নির্বাচন। এই ব্যবস্থায় নাগরিকরা একাধিক প্রার্থীর মধ্য থেকে তাদের প্রতিনিধি বেছে নেয়। এই বেছে নেওয়ার ব্যাপারটি হয় গোপন ভোটের মাধ্যমে। ভোটের ফলাফলে জয়ী প্রার্থীরা স্থানীয় ও জাতীয় পর্যায়ে সরকার গঠন, আইন প্রণয়ন ও শাসন পরিচালনায় অংশগ্রহণ করেন। আমাদের দেশে ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, পৌরসভা, সিটি কর্পোরেশন, জাতীয় সংসদ এমনকি রাষ্ট্রপতি পদে পর্যন্ত কোনো না কোনো পদ্ধতির নির্বাচন হয়। সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে উপযুক্ত প্রতিনিধি নির্বাচন করা গেলে কোনো দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে।

পাঠ-১: নির্বাচনের গুরুত্ব ও নির্বাচন পদ্ধতি

আজকের দিনে একটি দেশের বা শহরের সকল মানুষ একত্রে মিলিত হয়ে আইন প্রণয়ন বা দেশ শাসন করবে এটা সম্ভব নয়। এজন্য জনগণকে তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করতে হয়। প্রতিনিধিরাই তাদের হয়ে শাসন পরিচালনা করেন। এই প্রতিনিধি নির্বাচনের ব্যাপারটি হয় ভোটের মাধ্যমে। ভোট দিয়ে জনগণ কেবল তাদের প্রতিনিধিই নির্বাচন করে না, কী রকম শাসনব্যবস্থা তারা চায়, সে-সম্পর্কে তাদের মতামতও প্রকাশ করে। সেদিক থেকে আধুনিক রাষ্ট্রে নির্বাচনের কোনো বিকল্প নেই। বর্তমান বিশ্বে যত রকম শাসনব্যবস্থা প্রচলিত আছে তার মধ্যে গণতন্ত্রকেই সর্বোত্তম বিবেচনা করা হয়। আর নির্বাচনই হলো গণতন্ত্রের ভিত্তি। গণতন্ত্রের মূলকথা হলো নাগরিক বা জনসাধারণের মতামতের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ। আর নির্বাচন হলো জনমত প্রকাশের প্রধান ও বিধিসম্মত প্রক্রিয়া। সুতরাং নির্বাচন ছাড়া গণতন্ত্র চলতে পারে না।

নির্বাচন পদ্ধতি

নির্বাচন পদ্ধতি প্রধানত দুই-ধরনের : (ক) প্রত্যক্ষ নির্বাচন ও (খ) পরোক্ষ নির্বাচন।

প্রত্যক্ষ নির্বাচন

নাগরিকরা যখন সরাসরি ভোটে তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করে তখন তাকে প্রত্যক্ষ নির্বাচন বলা হয়। আমাদের দেশে জাতীয় সংসদের সদস্যরা প্রত্যক্ষ নির্বাচন পদ্ধতিতে নির্বাচিত হয়ে থাকেন। এছাড়া স্থানীয় সরকার যেমন ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য ও চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদের সদস্য ও চেয়ারম্যান, পৌরসভার কমিশনার ও মেয়র এবং সিটি কর্পোরেশনের কমিশনার ও মেয়র জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন।

পরোক্ষ নির্বাচন

এ পদ্ধতিতে নাগরিকরা সরাসরি ভোটে তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করে না। এখানে নির্বাচনটি হয় দুই ধাপে। প্রথমে নাগরিকরা তাদের সরাসরি ভোটে মধ্যবর্তী একটি স্তর বা প্রতিনিধি সংস্থার জন্য সদস্য নির্বাচন করে। তারপর এই প্রতিনিধিরাই ভোট দিয়ে চূড়ান্ত প্রতিনিধি নির্বাচন করেন। বাংলাদেশের

রাষ্ট্রপতি নির্বাচন এবং জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত মহিলা আসনের সদস্য নির্বাচন এ রকম পরোক্ষ পদ্ধতিতেই হয়ে থাকে। যেমন আমাদের দেশের রাষ্ট্রপতি জনগণ বা ভোটারদের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হন না। সাধারণ নির্বাচনের সময় নাগরিকরা ভোট দিয়ে জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচন করেন। এই নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই তাঁদের ভোটে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করেন। একইভাবে জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত মহিলা আসনের সদস্যরাও জনগণের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হন না। জাতীয় সংসদের নির্বাচিত সদস্যরাই ওই আসনগুলোর জন্য ভোট দিতে পারেন।

নিচে ছকের সাহায্যে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নির্বাচনের বৈশিষ্ট্য বোঝানো হলো।

প্রত্যক্ষ নির্বাচন

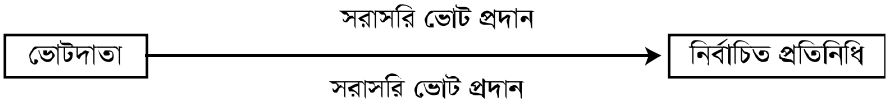

পরোক্ষ নির্বাচন

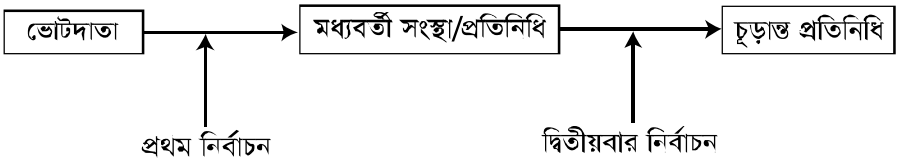

অনুশীলনমূলক কাজ

কাজ-১ : তোমার দেখা যেকোনো একটি নির্বাচনের বিবরণ দাও।

কাজ-২ : তোমাদের শ্রেণিকক্ষে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ পদ্ধতিতে নেতা নির্বাচনের প্রক্রিয়া অনুশীলন কর।

পাঠ-২ ও ৩ : বাংলাদেশের জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের নির্বাচন

জাতীয় ও স্থানীয় উভয় পর্যায়ে বাংলাদেশের মানুষ নির্বাচনের মাধ্যমে তাদের প্রতিনিধি নির্বাচন করে। এই প্রতিনিধিরা তাদের হয়ে জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ে সরকার ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে।

(ক) জাতীয় পর্যায়ের নির্বাচন : বাংলাদেশে জাতীয় পর্যায়ে সাধারণত তিন ধরনের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

১. **জাতীয় সংসদ নির্বাচন :** দেশব্যাপী সকল প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকের সরাসরি ভোটের মাধ্যমে জাতীয় সংসদের ৩০০টি আসনের সদস্য নির্বাচিত হন। এই প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত সদস্যগণই আবার নিজেরা ভোট দিয়ে জাতীয় সংসদের ৫০টি সংরক্ষিত মহিলা আসনের সদস্য নির্বাচন করেন। এলাকাভিত্তিক নির্বাচিত হলেও জাতীয় সংসদের এই মোট ৩৫০জন সদস্য সমগ্র দেশের প্রতিনিধিত্ব করেন। তাঁরাই দেশের জন্য আইন প্রণয়ন করেন ও অন্যান্য নীতিনির্ধারণী সিদ্ধান্ত নেন। জাতীয় সংসদ সদস্যদের মধ্য থেকেই সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের সমর্থনে দেশের সরকার গঠিত হয়। এসব দিক থেকে এটিই জাতীয় পর্যায়ে আমাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচন।

২. **রাষ্ট্রপতি নির্বাচন :** রাষ্ট্রপতি নির্বাচনও আমাদের একটি জাতীয় পর্যায়ের নির্বাচন। যদিও এই নির্বাচনটি প্রত্যক্ষ নয়, পরোক্ষ পদ্ধতিতে হয়ে থাকে। দেশের প্রাপ্তবয়স্ক সকল নাগরিকের ভোটের মাধ্যমে জাতীয় সংসদের সদস্যরা নির্বাচিত হন। আর জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত এই প্রতিনিধিরাই ভোট দিয়ে পাঁচ বছরের জন্য দেশের রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করেন।

৩. **গণভোট :** দেশের কোনো গুরুত্বপূর্ণ বা নীতিনির্ধারণী বিষয়ে সরাসরি জনগণের মতামত গ্রহণ বা যাচাইয়ের জন্য গণভোট অনুষ্ঠান করা হয়। এ নির্বাচন অনুষ্ঠানের কোনো নির্দিষ্ট সময় বা মেয়াদ নেই। প্রয়োজন অনুযায়ী যে-কোনো সময় এই গণভোট অনুষ্ঠিত হতে পারে।

(খ) স্থানীয় পর্যায়ের নির্বাচন : দেশের শাসনব্যবস্থা ও উন্নয়ন কর্মকাণ্ড সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে স্থানীয় পর্যায়ে আরও কয়েক ধরনের সরকার চালু রয়েছে। যেমন গ্রামাঞ্চলে ইউনিয়ন পরিষদ ও উপজেলা পরিষদ, শহরাঞ্চলে পৌরসভা, নগর বা সিটি কর্পোরেশন ইত্যাদি। নিচে এসব স্থানীয় সরকারের নির্বাচন সম্পর্কে আলোচনা করা হলো :

১. **ইউনিয়ন পরিষদ :** ইউনিয়ন পরিষদগুলো গ্রামভিত্তিক। বর্তমানে দেশে মোট ৪৪৬৬ টি ইউনিয়ন আছে। প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদে একজন চেয়ারম্যান, নয় জন সাধারণ সদস্য এবং সংরক্ষিত আসনে তিনজন মহিলা সদস্য থাকেন। সংশ্লিষ্ট এলাকার নাগরিকদের প্রত্যক্ষ ভোটে তাঁরা পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচিত হন।

২. **উপজেলা পরিষদ :** বর্তমানে দেশে ৪৮৬ টি উপজেলা আছে। প্রতিটি উপজেলায় রয়েছে উপজেলা পরিষদ। একজন চেয়ারম্যান, ২ জন ভাইস চেয়ারম্যান নিয়ে এই পরিষদ গঠিত হয়। এই ২ জন ভাইস চেয়ারম্যানের মধ্যে ১ জন মহিলা সংরক্ষিত আসনে নির্বাচনের মাধ্যমে আসতে পারে। উপজেলা চেয়ারম্যান সংশ্লিষ্ট এলাকার নাগরিকদের প্রত্যক্ষ ভোটে পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচিত হন।

৩. **পৌরসভা :** পৌরসভা শহরভিত্তিক সরকার কাঠামো। দেশে বর্তমানে ৩১৪ টি পৌরসভা আছে। একজন মেয়র, কয়েকজন কমিশনার ও সংরক্ষিত মহিলা আসনের কয়েকজন কমিশনার নিয়ে পৌরসভা গঠিত হয়। আর তাঁরা সবাই সংশ্লিষ্ট পৌরসভায় বসবাসরত নাগরিক বা ভোটারদের প্রত্যক্ষ ভোটে পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচিত হন।

৪. **সিটি কর্পোরেশন :** বাংলাদেশে বর্তমানে ১১ টি সিটিকর্পোরেশন আছে। এগুলো হলো ঢাকা উত্তর, ঢাকা দক্ষিণ, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, রংপুর, গাজীপুর, নারায়ণগঞ্জ, কুমিল্লা ও সিলেট। ঢাকা সিটি কর্পোরেশনকে আইনের মাধ্যমে ঢাকা উত্তর ও ঢাকা দক্ষিণ নামে দুটো কর্পোরেশন হিসেবে বিভক্ত করা হয়েছে। সিটি কর্পোরেশনের প্রধান হলেন মেয়র। প্রতিটি সিটি কর্পোরেশন কয়েকটি ওয়ার্ডে বিভক্ত থাকে। প্রতিটি ওয়ার্ডের জন্য একজন কাউন্সিলর থাকেন। মেয়র ও কাউন্সিলরগণ সবাই সংশ্লিষ্ট এলাকার নাগরিকদের প্রত্যক্ষ ভোটে পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচিত হন।

৫. **জেলা পরিষদ নির্বাচন :** তিনটি পার্বত্য জেলা ছাড়া বাংলাদেশের বাকি ৬১টি জেলায় একটি করে জেলা পরিষদ আছে। একজন চেয়ারম্যান, ১৫ জন সদস্য ও সংরক্ষিত মহিলা আসনের পাঁচজন সদস্য নিয়ে জেলা পরিষদ গঠিত হয়। তাঁরা সকলে পরোক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত হয়ে থাকেন। জেলা পরিষদের অন্তর্গত সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভার মেয়র ও কাউন্সিলর এবং উপজেলা ও ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যদের দ্বারা তাঁরা নির্বাচিত হন। জেলা পরিষদের কার্যকাল পাঁচ বছর।

৬. **পার্বত্য জেলা পরিষদ :** বাংলাদেশে তিনটি পার্বত্য জেলা আছে। এগুলো হলো রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান। প্রতিটি জেলায় একটি করে পার্বত্য জেলা পরিষদ আছে। একজন চেয়ারম্যান, নির্দিষ্ট সংখ্যক উপজাতীয় ও অ-উপজাতীয় সদস্য সমন্বয়ে এই জেলা পরিষদগুলো গঠিত হয়। তাঁরা সংশ্লিষ্ট পার্বত্য জেলার ভোটারদের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হবেন।

উপনির্বাচন : কোনো আসনের নির্বাচিত কোনো সদস্য মারা গেলে, পদত্যাগ করলে কিংবা অন্য কোনো কারণে আসন শূন্য হলে উক্ত আসনে পুনরায় নির্বাচন অনুষ্ঠান করে নতুন সদস্য বা জনপ্রতিনিধি নির্বাচন করতে হয়। একেই উপনির্বাচন বলে। উপনির্বাচন জাতীয় ও স্থানীয় উভয় পর্যায়েই হতে পারে।

অনুশীলনমূলক কাজ

কাজ-১ : তোমার নিজের এলাকায় সম্প্রতি হয়েছে এমন কোনো স্থানীয় নির্বাচন পর্যালোচনা করে নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :

(১) নির্বাচনের নাম (২) পদের নাম (৩) প্রার্থী সংখ্যা ও (৪) ফলাফল।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের সংরক্ষিত মহিলা আসন সংখ্যা কতটি ?

ক. ২০ খ. ৩০

গ. ৪০ ঘ. ৫০

২. নির্বাচন গুরুত্বপূর্ণ, কারণ–

i . সকলে মিলে দেশ শাসন সম্ভব নয়

ii. নির্বাচনে পছন্দমতো প্রতিনিধি নির্বাচন করা হয়

iii. এটি একটি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. i ও ii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

জনাব সাহানা আক্তার একটি স্থানীয় সরকার কাঠামোর নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি। তিনি এলাকার রাস্তাঘাট, ব্রীজ, কালভার্ট নির্মাণের ব্যাপারে তার অধীনে নির্বাচিত ০৯ জন সদস্যের সাথে আলোচনা করেন। সে সময় সংরক্ষিত আসনে নির্বাচিত সদস্যগণও অংশগ্রহণ করেন।

৩. সাহানা যে স্থানীয় সরকার কাঠামোর প্রধান জনপ্রতিনিধি তার নাম কী?

ক. জেলা পরিষদ খ. সিটি কর্পোরেশন

গ. পৌরসভা ঘ. ইউনিয়ন পরিষদ

৪. উক্ত স্থানীয় সরকার কাঠামোর কার্যক্রমের উপর সরকারের নির্ভর করে–

ক. উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সঠিক বাস্তবায়ন

খ. নীতিমালার সঠিক প্রয়োগ

গ. পক্ষে জনমত গঠন করা

ঘ. বাজেট প্রণয়ন করা

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. সপ্তম শ্রেণির শ্রেণিশিক্ষক জনাব আমজাদ ক্লাশ ক্যাপ্টেন নির্বাচিত করার কথা বললে অনেকেই ক্যাপ্টেন হওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করে। শ্রেণিশিক্ষক একটি বাক্স বানিয়ে সকল শিক্ষার্থীকে তাদের পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দেয়ার ব্যবস্থা করেন। ভোট গণনা শেষে ফরিদা ১ম, সাব্বির ২য় এবং নেহাল ৩য় স্থান অধিকার করার ঘোষণা দিলে শিক্ষার্থীরা করতালি দিয়ে তিন ক্যাপ্টেনকে অভিনন্দন জানায়। এরপর যারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল তারা একে অপরকে অভিবাদন জানায়।

ক. আধুনিক গণতন্ত্রের ভিত্তি কী?

খ. রাষ্ট্রপতি নির্বাচন প্রক্রিয়া কোনটি? ব্যাখ্যা কর।

গ. আমজাদ সাহেবের ক্লাশের নির্বাচন প্রক্রিয়াটির ধরন ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীরা নির্বাচিত ক্যাপ্টেনকে অভিনন্দন জানানো গণতন্ত্রের ভিতকে মজবুত করবে'– উত্তরের পক্ষে তোমার মতামত দাও।

২. ঘটনা-১

জেলা শহরের রেজিনা চৌধুরী জাতীয় সংসদের সদস্য নির্বাচিত হয়ে এলাকার উন্নয়নে যেমন কাজ করেন তেমনি দেশের নীতি নির্ধারণী বিষয়েও অবদান রাখেন।

ঘটনা-২

সুজাত আলী মণ্ডল তার ইউনিয়নের নির্বাচনে বিপুল ভোটে জয়লাভ করে এলাকায় উন্নয়নে কাজ করেন। তিনি ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যদের পাশাপাশি এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিদের পরামর্শ নিয়ে উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করেন।

ক. রাষ্ট্রপতি কাদের ভোটে নির্বাচিত হন?

খ. চূড়ান্ত প্রতিনিধি কোন নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত হয় ? ব্যাখ্যা কর।

গ. সুজাত আলী মণ্ডলের চেয়ারম্যান হিসেবে নির্বাচিত হওয়াটি কোন নির্বাচনের অন্তর্গত তা– ব্যাখ্যা কর।

ঘ. দেশের জাতীয় উন্নয়নে ঘটনা-১ ও ২ এর মধ্যে কোনটি অধিক প্রভাব বিস্তার করে বলে তুমি মনে কর। যুক্তি দাও।

অধ্যায়-ছয়

বাংলাদেশের জলবায়ু

'আবহওয়া' ও 'জলবায়ু' কথা দুটোর মানে এক বলে মনে হলেও দুটো কথার দ্বারা ঠিক এক বিষয় বোঝায় না। আবহাওয়া মানে হলো কোনো একটি এলাকার এক দিন বা দিনের এমন কোনো বিশেষ সময়ের বৃষ্টি, তাপ, বাতাস, ঝড় ইত্যাদি অবস্থা। তাপমাত্রা, বায়ুর চাপ ও গতি, বাতাসের আর্দ্রতা এবং বৃষ্টিপাতের পরিমাণ হিসাব করে এটা নির্ধারণ করা হয়। আবহাওয়া প্রতিদিন, এমন কি ঘণ্টায় ঘণ্টায় বদলাতে পারে, বদলায়ও। অন্যদিকে কোনো এলাকার ৩০ থেকে ৪০ বছরের গড় আবহাওয়াকে বলা হয় তার জলবায়ু। তবে কোনো দেশ বা অঞ্চলের জলবায়ু বোঝার জন্য ওই উপাদানগুলো ছাড়াও আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আছে। যেমন কোন অক্ষরেখা বা দ্রাঘিমারেখায় দেশটির অবস্থান, সমুদ্র থেকে তার দূরত্ব, সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে উচ্চতা, বায়ুপ্রবাহ, সমুদ্রস্রোত, ভূমির ঢাল, মৃত্তিকার গঠন, বনভূমির পরিমাণ ও অবস্থান প্রভৃতিও জলবায়ুর প্রকৃতি নির্ণয়ের উপাদান।

পাঠ-১ : বাংলাদেশের জলবায়ুর প্রকৃতি

বাংলাদেশ ক্রান্তীয় অঞ্চলে অবস্থিত হওয়ায় এখানকার জলবায়ু ক্রান্তীয় মৌসুমি জলবায়ু। সমুদ্রের নিকটবর্তী হওয়ায় ও মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে এখানে শীত বা গ্রীষ্ম কোনোটাই খুব তীব্র নয়। এখানে গ্রীষ্মকালটা উষ্ণ ও বৃষ্টিবহুল এবং শীতকাল শুষ্ক। হিমালয় পর্বতমালা যদিও বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী নয়, বেশ উত্তরে, তবু তা শীতকালে বাংলাদেশকে উত্তর থেকে আসা হিমপ্রবাহ থেকে রক্ষা করে। তাই শীতকাল এখানে দীর্ঘ হয় না। শীতকালে বাংলাদেশের তাপমাত্রা ১৮°-২১° সেলসিয়াসের মধ্যে থাকে। তবে উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমে এই তাপমাত্রা কখনো কখনো ৪°/৫° সেলসিয়াস পর্যন্ত নেমে আসে। ঠাকুরগাঁ, পঞ্চগড়, শ্রীমঙ্গল এসব জায়গায় সবচেয়ে বেশি শীত।

বৈশাখ মাস থেকে বাংলাদেশে গ্রীষ্ম ঋতু আরম্ভ হয়। ইংরেজি ক্যালেন্ডারের হিসেবে সময়টা এপ্রিলের মাঝামাঝি। গ্রীষ্মকালে দেশের উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে কখনও কখনও তাপমাত্রা ৪০°-৪৫° সেলসিয়াস পর্যন্ত উঠে। গ্রীষ্মের মৌসুমের শুরুতে কোথাও কোথাও কালবৈশাখী ঝড় হয়। সমুদ্র উপকূলে ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসও হয়।

বর্ষাকালে বঙ্গোপসাগরে দক্ষিণ, দক্ষিণ-পশ্চিমদিক থেকে জলীয়বাষ্পপূর্ণ বাতাস প্রবাহিত হয়। একে গ্রীষ্মের মৌসুমি বায়ু বলা হয়। এই মৌসুমি বায়ুর প্রভাবে বাংলাদেশে প্রচুর বৃষ্টি হয়। তবে দেশের সব এলাকায় সমান বৃষ্টিপাত হয় না।

বর্ষাকাল

সিলেট, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার এসব এলাকায় বেশি বৃষ্টি হয়। অন্যদিকে রাজশাহী, পাবনা, কুষ্টিয়া এসব এলাকায় কম বৃষ্টি হয়। শরৎকালেও বাংলাদেশে বৃষ্টি হয়, তবে এ সময় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ থাকে খুব কম। বর্ষাকালে নদী-ভাঙনের পরিমাণও বেড়ে যায়। এপ্রিল-মে ও অক্টোবর-নভেম্বর বছরের এ দুটি সময়ে বাংলাদেশে বেশ ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস হয়।

বাংলাদেশের জলবায়ুকে বলা হয় সমভাবাপন্ন। অর্থাৎ এখানে অনুকূল ও প্রতিকূল দুই ধরনের আবহাওয়ারই প্রভাব সমান। অনুকূল আবহাওয়ার ফলে বাংলাদেশের প্রকৃতি সুজলা-সুফলা-শস্য-শ্যামলা। অন্যদিকে প্রতিকূল আবহওয়ার প্রভাবে ঝড়, জলোচ্ছ্বাস, বন্যা, খরা, কালবৈশাখী, টর্নেডো ও অতিবৃষ্টির মতো কোনো কোনো দুর্যোগ বাংলাদেশের মানুষের জন্য দুর্ভোগ বয়ে আনে।

অনুশীলনমূলক কাজ

কাজ-১ : বাংলাদেশের জলবায়ুর বৈশিষ্ট্যগুলো দলীয় আলোচনার মাধ্যমে তুলে ধর।

কাজ-২ : বাংলাদেশে প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে কী ধরনের দুর্যোগ হয়?

পাঠ-২ : বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের কারণ

পৃথিবীর জলবায়ু আগের মতো নেই। নানা কারণে জলবায়ুর পরিবর্তন পরিলক্ষিত হচ্ছে। বাংলাদেশেও এর প্রভাব পড়ছে। ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে আবহাওয়ার পরিবর্তন হচ্ছে না। যেমন- বর্ষাকালে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কমে যাচ্ছে। শীতকালে শীত দেরিতে আসছে এবং সল্পসময়ে চলে যাচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে প্রাকৃতিক দুর্যোগের পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে। বন্যা

জলোচ্ছ্বাস ও খরার প্রকোপ বাড়ছে। নদী, খাল, বিল শুকিয়ে যাচ্ছে। এর পেছনে প্রাকৃতিক কারণ যেমন রয়েছে তেমনি রয়েছে মানব সৃষ্টি কারণও। শুধু বাংলাদেশেই নয় সারা পৃথিবীতেই জলবায়ু পরিবর্তনের মূল কারণ হচ্ছে বৈশ্বিক উষ্ণায়ন (Global Warming)। উষ্ণায়নের ফলে মেরু অঞ্চলের বরফ অস্বাভাবিকভাবে গলে যাচ্ছে। এই বরফগলা জলরাশি সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বাড়িয়ে দিচ্ছে। ফলস্বরূপ বাংলাদেশের দক্ষিণাংশের নিম্নঅঞ্চলসহ পৃথিবীর সমুদ্র তীরবর্তী দেশগুলোর ডুবে যাওয়ার আশঙ্কা বাড়ছে। এই বৈশ্বিক উষ্ণায়নের অন্যতম কারণ হলো গ্রিনহাউস গ্যাস। কার্বন ডাইঅক্সাইড, মিথেন, নাইট্রাস অক্সাইড, ক্লোরো ফ্লোরো কার্বন প্রভৃতি গ্যাসকেই একসাথে গ্রিনহাউস গ্যাস বলা হয়। বায়ুমণ্ডলে এই গ্যাসগুলো অতিরিক্ত মাত্রায়

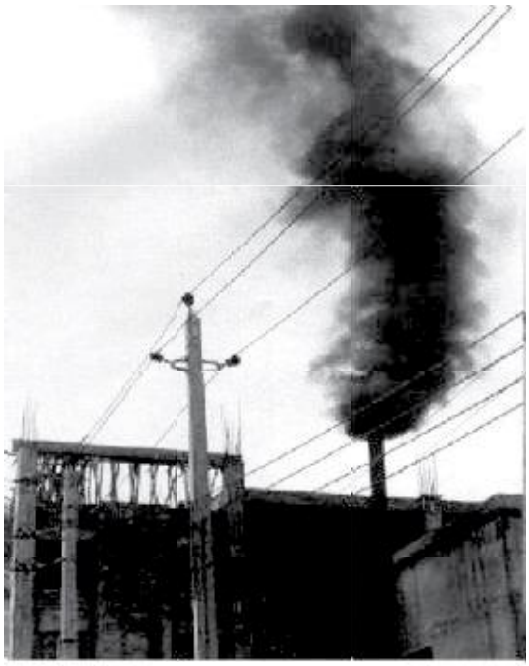

কালো ধোঁয়া

সঞ্চারিত হয়ে পৃথিবীর তাপমাত্রা বাড়িয়ে তোলে। আর বায়ুমণ্ডলে গ্রিনহাউস গ্যাস বৃদ্ধির জন্য মানুষের কাজকর্মই সবচেয়ে বেশি দায়ী। মানুষের তৈরি গ্রিনহাউস গ্যাসের মধ্যে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণই সবচেয়ে বেশি। বিদ্যুৎ উৎপাদন, যানবাহনের তেল ও গ্যাসের ধোঁয়া, ইটের ভাটা প্রভৃতি থেকে এই কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন হয়। আগের তুলনায় বর্তমানে বায়ুমণ্ডলে গ্রিনহাউস গ্যাস সঞ্চারের পরিমাণ বহুগুন বেড়ে গেছে। এ থেকে আমরা সহজেই জলবায়ু পরিবর্তনের বিপদটি বুঝতে পারি।

পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলের মতো বাংলাদেশেও জলবায়ুর পরিবর্তনের কারণগুলো প্রায় একই। তবে পৃথিবীর শিল্পোন্নত দেশগুলো যেপরিমাণ জ্বালানি ব্যবহার করে, বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল

বনভূমি ধ্বংস

দেশগুলো ততটা করে না। সেদিক থেকে জলবায়ুর পরিবর্তন বা পরিবেশের বিপর্যয়ের জন্য উন্নত দেশগুলোই বেশি দায়ী– যদিও তার ফলটা আমাদেরকেই বেশি ভোগ করতে হয়।

ক্রমাগত বনভূমি ধ্বংসের কারণেও পৃথিবীর উষ্ণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশেষজ্ঞদের মতে একটি দেশের মোট আয়তনের শতকরা প্রায় ২৫ ভাগ বনভূমি থাকা দরকার। কিন্তু বাংলাদেশে এই বনভূমির পরিমাণ মাত্র ১৭ ভাগ। তারপরও অবাধে গাছ ও পাহাড় কাটা ও অন্যান্য কারণে এই বনভূমির পরিমাণ ক্রমাগত কমে আসছে। ফলে সাম্প্রতিককালে বাংলাদেশে বৃষ্টিপাতের পরিমাণও কমে গেছে।

অনুশীলনমূলক কাজ

কাজ-১ : গ্রিনহাউস গ্যাস বলতে কোন কোন গ্যাসকে বোঝায়? বাংলাদেশে এ গ্যাসগুলো কীভাবে উষ্ণতা বৃদ্ধি করছে?

কাজ-২ : জলবায়ু স্বাভাবিক রাখার ক্ষেত্রে মানুষ কী ভূমিকা পালন করতে পারে?

পাঠ- ৩, ৪ ও ৫ : জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট দুর্যোগ

বাংলাদেশ একটি দুর্যোগপ্রবণ দেশ। এ দেশে নানা ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘটে। এসব দুর্যোগের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস, বন্যা, নদীভাঙন, খরা, শৈত্যপ্রবাহ, টর্নেডো, কালবৈশাখী প্রভৃতি। এছাড়াও বাংলাদেশ ভূমিকম্পের ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে।

ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস

ঘূর্ণিঝড়

কোনো স্থানের বাতাসের তাপ অত্যাধিক বৃদ্ধি পেলে সেখানকার বাতাস উপরে উঠে যায়। ফলে ওই অঞ্চলের বাতাসের চাপ কমে যায়। একে নিম্নচাপ সৃষ্টি হওয়া বলে। এ সময় আশেপাশের অঞ্চল থেকে বাতাস প্রবল বেগে ওই নিম্নচাপ অঞ্চলের দিকে ছুটে আসে। একেই বলে সাইক্লোন বা ঘূর্ণিঝড়। বাংলাদেশে অধিকাংশ ঘূর্ণিঝড় হয় বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট নিম্নচাপের কারণে। সমুদ্রে সৃষ্ট নিম্নচাপ ও ঝড়ের ফলে সমুদ্রের লোনা জল বিশাল উচ্চতা নিয়ে ও তীব্রবেগে উপকূলে আছড়ে পড়ে এবং স্থলভাগকে প্লাবিত করে। একেই বলে জলোচ্ছ্বাস। বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে এ-পর্যন্ত কয়েকবার ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস মারাত্মক আঘাত হেনেছে। এতে অসংখ্য মানুষের প্রাণহানি ঘটেছে। গবাদি পশু ও ফসলের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। ১৯৭০ সালের ১২ই নভেম্বর বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে ঘটে যাওয়া এমনি একটি ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে প্রায় দশ লক্ষ মানুষের মৃত্যু হয়। সাম্প্রতিককালে ঘটে যাওয়া এ রকম দুটি বড় ঘূর্ণিঝড় হলো সিডর ও আইলা। ২০০৭ সালের ১৫ই

নভেম্বর সিডর-এ দেশের ২৮টি জেলার প্রায় ৩০ লক্ষ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। আর ২০০৯ সালের ৫ মে আইলায়ও মানুষ, পশুপাখি, ফসল ও ঘরবাড়ির ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। ঘূর্ণিঝড়ের আগে সাধারণত আবহাওয়া বিভাগ থেকে এ সংক্রান্ত পূর্বাভাস ও সতর্কবাণী প্রচার করা হয়। আমরা যদি সে সতর্কবাণী মেনে আগে থেকে সাবধান হই, তবে ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসের সময় প্রাণহানি এড়ানো যায়। এ সময় দুর্যোগ মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিয়ে ঘূর্ণিঝড়-আশ্রয়কেন্দ্র ও নিরাপদ স্থানে আশ্রয় নিতে হবে।

বন্যা

বন্যা

বাংলাদেশে প্রতি বছরই কমবেশি বন্যা হয়। বাংলাদেশের প্রধান তিনটি নদী পদ্মা, যমুনা ও মেঘনাসহ এদেশের প্রায় সবগুলো নদীরই উৎস ভারতে। এসব নদনদী হিমালয়ের বরফগলা ও উজানে বৃষ্টিপাতের ফলে সৃষ্ট বিপুল পানিপ্রবাহ বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে বয়ে নিয়ে বঙ্গোপসাগরে ফেলে। বৃষ্টির পানি ও পাহাড় থেকে নেমে আসা পানি একসঙ্গে মিশে নদীগুলোর পানি উপচে দু-কূলের জনপদকে প্লাবিত করে। এভাবে বন্যা সৃষ্টি হয়। অন্যদিকে বর্ষা মৌসুমে নদীগুলো লক্ষ লক্ষ টন পলি বয়ে আনে, যার সবটা সাগরে যায় না, কিছু অংশ নদীর তলদেশে জমা হয়ে তাকে ভরাট করে ফেলে। এতে নদীর জল ধারণ ক্ষমতা কমে যায়। পানি উপচে আশেপাশের এলাকা প্লাবিত হয়। প্রায় প্রতি বছর বন্যায় আমাদের দেশে মানুষ ও সম্পদের অনেক ক্ষতি হয়। ব্যাপক ফসলহানি ঘটে, ফলে খাদ্যাভাব দেখা দেয়। অনেক মানুষ কাজ হারিয়ে বেকার হয়ে পড়ে। ১৯৮৮, ১৯৯৮ ও ২০০৪ সালে এদেশে বড় আকারের বন্যা হয়েছে। বর্তমানে বিশেষজ্ঞরা বলেন, বন্যা একেবারে প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়। তবে বন্যার ক্ষয়ক্ষতি কমানো সম্ভব।

নদীভাঙন

নদীভাঙন বাংলাদেশের একটি নিয়মিত দুর্যোগ। প্রতিবছর বিশেষ করে বর্ষা মৌসুমে নদীভাঙন দেখা দেয়। নদীভাঙনের একটি কারণ হলো বাংলাদেশের নদীগুলোর গতিপথের ধরন। আমাদের অনেক নদীরই গতিপথ আঁকাবাঁকা। নদীর বাঁকগুলোও ঘনঘন। ফলে পানির প্রবল তোড় সোজাপথে প্রবাহিত হতে না পেরে নদীর পাড়ে এসে আঘাত করে। ফলে নদীর পাড় ভাঙতে থাকে। এছাড়াও নদীর গতিপথ পরিবর্তন, নদীপাড়ের মাটির দুর্বল গঠন, নদীভরাট ও যেখানে-সেখানে বাঁধ দিয়ে নদী শাসনের চেষ্টা, নদীর পাড়ে যথেষ্ট গাছপালা না থাকা ইত্যাদি কারণেও নদীভাঙন ঘটে নদীভাঙনের ফলে এ দেশে হাজার হাজার একর আবাদি জমি, বসতবাড়ি ও অন্যান্য স্থাপনা নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। এর ফলে প্রতিবছর এ দেশের হাজার হাজার মানুষ ভিটেমাটি ও কাজের সংস্থান হারিয়ে সর্বস্বান্ত হয়ে পড়ছে। যেসব কারণে নদীভাঙন ঘটে থাকে সে-সম্পর্কে সচেতন হলে নদীভাঙন ও তার ক্ষয়ক্ষতি অনেকখানি কমানো সম্ভব।

নদী ভাঙন

খরা

খরা বাংলাদেশের একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ। প্রয়োজনীয় বৃষ্টিপাতের অভাবে খরা হয়। প্রায় প্রতি বছর বসন্তের শেষ ও গ্রীষ্মের শুরুতে বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে খরা দেখা যায়। উত্তরাঞ্চলে এই খরার প্রকোপ বেশি। পানির অভাবে জমির সেচকাজ ব্যাহত হয়, ফসল নষ্ট হয়। বৃষ্টিপাতের অভাব ছাড়াও বিভিন্ন নদীর উজানে বাঁধ নির্মাণ, পরিবেশ দূষণ ইত্যাদি কারণেও খরা হয়। এই

খরা

প্রাকৃতিক দুর্যোগটি পুরোপুরি প্রতিরোধ করা হয়তো সম্ভব নয়। তবে সচেতন হলে ও সময়মতো ব্যবস্থা নিলে খরাজনিত ক্ষয়ক্ষতি অনেকখানি কমানো যেতে পারে। এজন্য ভূগর্ভস্থ পানির স্তর পরীক্ষা করে মাটির নিচ থেকে পানি উত্তোলন বন্ধ করতে হবে। বর্ষা মৌসুমে বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ করে রাখতে হবে। সুষ্ঠু পানি-ব্যবস্থাপনা ও পানি-ব্যবহারে গণসচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে।

শৈত্যপ্রবাহ

বাংলাদেশ শীতপ্রধান দেশ না হলেও কোনো কোনো বছরে ডিসেম্বর-জানুয়ারি মাসে মৃদু থেকে মাঝারি শৈত্যপ্রবাহ দেখা যায়। বিশেষ করে দেশের উত্তরাঞ্চলে এর তীব্রতা বেশি হয়। প্রবল শীতে মানুষের প্রাণহানিও ঘটে। শৈত্যপ্রবাহের ফলে জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষ কাজ পায় না। শৈত্যপ্রবাহে ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়। বাসস্থান ও শীতবস্ত্রের অভাবে দরিদ্র জনগোষ্ঠীই বেশি দুর্দশায় পড়ে। সরকার ও সমাজের সচেতন মানুষের সহায়তা ও উদ্যোগে শৈত্যপ্রবাহে মানুষের কষ্ট অনেকটা কমানো সম্ভব।

টর্নেডো

বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে টর্নেডো অন্যতম। এটি এক ধরনের প্রচণ্ড গতিসম্পন্ন ঘূর্ণিঝড়। স্থলভাগে নিম্নচাপের ফলে এর উৎপত্তি হয়। টর্নেডো এমন একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ যার সম্পর্কে কোনো পূর্বাভাস বা সতর্কসংকেত দেওয়া যায় না। টর্নেডো শুরুর আগ দিয়ে আকাশে ফানেল বা হাতির শূরের মতো মেঘ দানা বাঁধে। এই হাতির শূরের মতো মেঘ ক্রমে ভূপৃষ্টের নিম্নচাপ অঞ্চলের দিকে ধেয়ে আসে। এই মেঘটি ঘুরতে ঘুরতে একস্থান থেকে অন্যস্থানে ছুটে যায়। ফানেলের অভ্যন্তরে প্রচুর ঘূর্ণন চলতে থাকে। এই শূরের মতো টর্নেডো যখন মাটি স্পর্শ করে তখন সেখানকার বাড়ি ঘর, গাছপালা, পশুপাখি, মানুষ সব কিছুকে এই ঘূর্ণির দ্বারা তছনছ করে ফেলে। এমনকি এক স্থানের জিনিস পত্র অন্যস্থানে নিয়ে যায়। এটি কোনো স্থানে আচমকা আঘাত হেনে মুহূর্তের মধ্যে সবকিছু লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে যায়। এর স্থায়িত্বকাল হয় খুবই অল্প, কয়েক সেকেণ্ড থেকে কয়েক মিনিট মাত্র। খুব কম জায়গায় এটি আঘাত হানে। বাংলাদেশে সাধারণত ফাল্গুনের শেষ থেকে জ্যৈষ্ঠ মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত সময়ে টর্নেডো হয়ে থাকে।

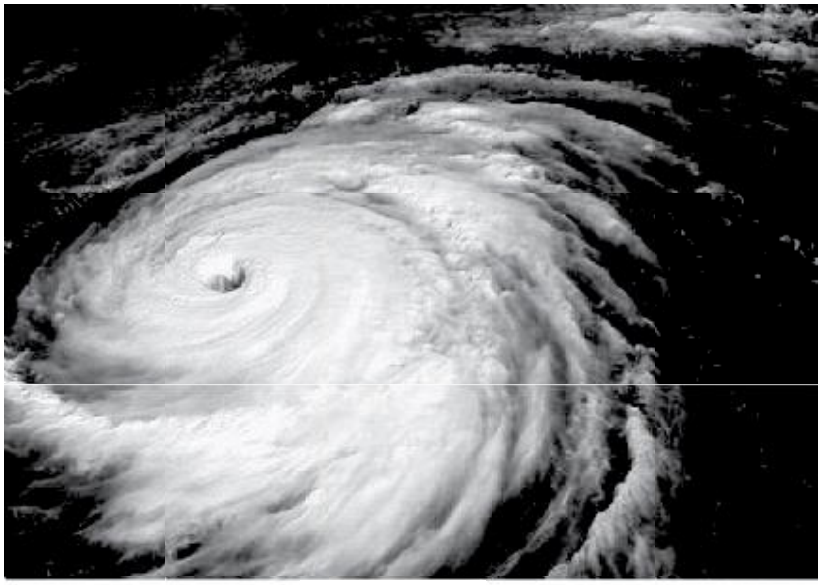

টর্নেডো

কালবৈশাখী

কালবৈশাখী

কোনো স্থানের তাপমাত্রা প্রচুর বেড়ে গেলে সেখানকার বাতাস হালকা হয়ে উপরে যায়। তখন পাশের অঞ্চলের অপেক্ষাকৃত শীতল বাতাস প্রবল বেগে এই শূন্যস্থানে ধেয়ে আসে ও ঝড়ের সৃষ্টি করে যা আমাদের দেশে কাল বৈশাখী ঝড় নামে পরিচিত। কালবৈশাখী হলো এক ধরনের ক্ষণস্থায়ী ও স্থানীয়ভাবে সৃষ্ট প্রচণ্ড ঝড়। সাধারণত বৈশাখ মাসেই এ ঝড় বেশি হয় বলে একে কালবৈশাখী বলা হয়। প্রায় সময় উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে এ ঝড়টা আসে। বাংলাদেশে প্রতি বছরই কমবেশি এ ঝড় হয়ে থাকে। টর্নেডোর মতো অত বিধ্বংসী না হলেও এ ঝড়েও জানমালের প্রচুর ক্ষতি হয়। ঘরবাড়ি উড়িয়ে নেয়, গাছপালা উপড়ে ফেলে। নৌ-চলাচলে বিঘ্ন ঘটায়। কালবৈশাখীর কবলে পড়ে ভয়াবহ নৌ-দুর্ঘটনাও ঘটে। এজন্য কালবৈশাখীর মৌসুমে নদীপথে নৌকা ও লঞ্চ চলাচলে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করা প্রয়োজন।

ভূমিকম্প

পৃথিবীতে যত রকম প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘটে তার মধ্যে ভূমিকম্পই সবচেয়ে অল্প সময়ে সবচেয়ে বেশি ধ্বংসযজ্ঞ ঘটায়। ভূমিকম্পের ব্যাপারেও কোনো আগাম সতর্কসংকেত দেওয়া সম্ভব নয়। মানুষ কিছু বুঝে উঠার আগেই একটি বা কয়েকটি ঝাঁকুনিতে পুরো এলাকাকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে দিয়ে যায়। একই স্থানে সাধারণত পর পর কয়েকবার বড়, মাঝারি ও মৃদু ধরনের ভূমিকম্প হতে পারে। ইরান, চীন, মেক্সিকো, চিলি ও জাপানের ভূমিকম্পে আমরা তার প্রমাণ পেয়েছি। বাংলাদেশ ভূমিকম্প ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। বিশেষ করে ঢাকা, সিলেট, রংপুর ও চট্টগ্রাম অঞ্চলে এই ঝুঁকি বেশি। চট্টগ্রাম ও সিলেট অঞ্চলে ইদানীং প্রায়ই মৃদু ভূমিকম্প হচ্ছে। ২০১১ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বর সংঘটিত ভূমিকম্পটি ছিল বেশ প্রচণ্ড। এ ভূমিকম্পে সারা বাংলাদেশ কেঁপে উঠে। ভূমিকম্প প্রতিরোধের কোনো ব্যবস্থা এখনও মানুষের জানা নেই। তবে ভূমিকম্পের সময় আত্মরক্ষা এবং ভূমিকম্পের পর উদ্ধার ও ত্রাণকাজ সম্পর্কে মানুষকে ধারণা দিতে হবে।

ভূমিকম্প

ভূমিকম্পে করণীয় সম্পর্কে ধারণা, সচেতনতা ও প্রস্তুতি থাকলে প্রাণহানি অনেক কমানো যেতে পারে।

অনুশীলনমূলক কাজ

কাজ-১ : বাংলাদেশে কী কী প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘটে তার একটি তালিকা তৈরি কর।

কাজ-২ : বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের ধরন ও তার ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন তৈরি কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. বাংলাদেশে সাধারণত কোন মৌসুমে নদীভাঙন দেখা দেয়?

ক. গ্রীষ্ম খ. বর্ষা
গ. শীত ঘ. বসন্ত

২. আমাদের দেশে নদীভাঙনের কারণ হচ্ছে-

i. নদীগুলোর চলার পথ সোজা না হওয়া
ii. নদীর পাড়ের মাটির দুর্বল গঠন
iii. নদীর পাড়ে প্রচুর গাছপালা থাকা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii
গ. i ও ii ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

সাবিহা টেবিলে বসে পড়ছিল। হঠাৎ সে টের পেল তার পড়ার চেয়ার, টেবিল ও অন্যান্য আসবাবপত্র মৃদুভাবে কাঁপছে। সে বিষয়টি বুঝতে পেরে আতঙ্কিত হয়ে রুম থেকে দ্রুত বেরিয়ে পড়ে।

৩. সাবিহার অনুভব করা বিষয়টি কী?

ক. জলোচ্ছ্বাস খ. ভূমিকম্প
গ. ঘূর্ণিঝড় ঘ. টর্নেডো

৪. সাবিহার আতঙ্কিত হওয়ার কারণ হচ্ছে–

i. পুরো এলাকা মুহূর্তেই ধ্বংসস্তূপে পরিণত হতে পারে
ii. একটি কম্পনের পর পরই আর একটি কম্পন শুরু হবে
iii. আত্মরক্ষা সংক্রান্ত কোনো ধারণা না থাকা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. ২৩শে সেপ্টেম্বর ২০১১ এর দৈনিক পত্রিকায় একটি খবর দেখে জারিফ চমকে উঠে। বিশ্বব্যাপী এক ধরনের গ্যাসের অধিক হারে নিঃসরণের জন্য জলবায়ুর ব্যাপক পরিবর্তন হচ্ছে। ফলে বাংলাদেশ ও মালদ্বীপের মতো সমুদ্রপৃষ্ঠের কাছাকাছি উচ্চতার দেশগুলো আজ হুমকির মুখে পড়েছে। এই বিপর্যয়ের জন্য জারিফ মানবসৃষ্ট নানা কর্মকাণ্ডকে দায়ী করে এক ধরনের উৎকণ্ঠা অনুভব করে।

ক. বাংলাদেশ কোন অঞ্চলে অবস্থিত?

খ. বাংলাদেশের জলবায়ুতে মৌসুমি বায়ুর প্রভাব ব্যাখ্যা কর।

গ. বাংলাদেশ কী ধরনের হুমকির মুখোমুখি – ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বিপর্যয়ের জন্য মানবসৃষ্ট কর্মকাণ্ডই দায়ী – তোমার উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দাও।

২. আরিক টেলিভিশনে "বাংলাদেশের প্রাকৃতিক দুর্যোগ" সংক্রান্ত একটি প্রতিবেদন দেখছিল। প্রতিবেদনের প্রথম অংশে দেখানো হয় কীভাবে উত্তরাঞ্চলের একটি গ্রামে প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে কৃষিজমিগুলো শুকিয়ে যাচ্ছে। প্রতিবেদনের দ্বিতীয় অংশে দেখানো হয় উপকূলীয় অঞ্চলে প্রাকৃতিক দুর্যোগ কীভাবে এর জনজীবন ও পরিবেশকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। ঐ অঞ্চলের অবস্থানগত কারণে প্রায়শই দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া বিরাজ করে।

ক. প্রচণ্ড গতিসম্পন্ন ঘূর্ণিঝড়কে কী বলে?

খ. কালবৈশাখী কী? বুঝিয়ে লেখ।

গ. প্রতিবেদনের দ্বিতীয় অংশে দেখানো দুর্যোগ ঘটার কারণ ব্যাখ্যা কর।

ঘ. প্রতিবেদনের প্রথম অংশে দেখানো দুর্যোগের ক্ষয়ক্ষতি কমাতে কী ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় – ব্যাখ্যা কর।

অধ্যায়-সাত

বাংলাদেশের জনসংখ্যা পরিস্থিতি

পাঠ- ১ ও ২ বাংলাদেশের জনসংখ্যা

বাংলাদেশ পৃথিবীর ঘনবসতিপূর্ণ একটি দেশ। এ দেশের আয়তন ১,৪৭,৫৭০ বর্গ কিলোমিটার। দেশের বর্তমান জনসংখ্যা ১৪ কোটি ৯৭ লক্ষ ৭২ হাজার ৩৬৪ জন এবং প্রতি বর্গকিলোমিটারে বাস করে ১০১৫ জন। এ দেশের জনসংখ্যা ক্রমাগত বাড়ছে। দশ বছর আগে, ২০০১ সালে এ দেশের জনসংখ্যা ছিল ১২ কোটি ৯৩ লক্ষ এবং প্রতি বর্গকিলোমিটারে বাস করত ৮৩৯ জন মানুষ।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে। এরপর ১৯৭৪ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী এ দেশের জনসংখ্যা ছিল মাত্র ৭.৬৪ কোটি। ২০০১ সালে এ জনসংখ্যা দাঁড়ায় ১২.৯৩ কোটি। অর্থাৎ ২৭ বছরে বাংলাদেশের জনসংখ্যা বেড়েছে ৫.২৮ কোটি। ২০০১ সালের আদমশুমারির প্রাথমিক রিপোর্ট অনুযায়ী বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার শতকরা ১.৪৮ ভাগ। জনসংখ্যা বৃদ্ধির এই হার পূর্ববর্তী বছরগুলোর তুলনায় কম। ২০০৭ সালে বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যা ছিল ১৪ কোটি ৬ লক্ষ এবং জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ছিল শতকরায় ১.৪১ ভাগ।

আমাদের জনসংখ্যা দ্রুত বাড়ছে। ১৯৬১ সালে জনসংখ্যা ৫.৫২ কোটি এবং ১৯৯১ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে ১১.১৫ কোটিতে। অর্থাৎ, দেশের জনসংখ্যা এই ৩০ বছরে ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে। অতীতে কিন্তু এত দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেত না। ১৮৬০ সালে বাংলাদেশ ভূখণ্ডে জনসংখ্যা ছিল মাত্র ২ কোটি। ১৯৪১ সালে তা হয়েছে ৪.২০ কোটি। অর্থাৎ ৮০ বছরে জনসংখ্যা দ্বিগুণ হয়েছে। তারও আগে দ্বিগুণ হতে সময় লেগেছে প্রায় দুশ বছর।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ

একটি দেশের জনসংখ্যা অনেক কারণে বৃদ্ধি পায়। তার মধ্যে প্রধান কয়েকটি কারণ নিয়ে আলোচনা করা হলো।

জন্মহার ও মৃত্যুহারের ব্যবধান

জনসংখ্যা হ্রাস-বৃদ্ধির মুখ্য কারণ হচ্ছে জন্ম ও মৃত্যু। কোনো দেশে বছরে যত শিশু জন্মগ্রহণ করে তার চেয়ে কমসংখ্যক মানুষ মারা গেলে সে দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়। অপরদিকে যত শিশু জন্মগ্রহণ করে তার চেয়ে বেশি মারা গেলে জনসংখ্যা হ্রাস পায়। আর জন্ম ও মৃত্যু সমান হলে জনসংখ্যা স্থির থাকে। এ থেকে বোঝা যায় যে, জন্ম ও মৃত্যুর ফলেই মূলত জনসংখ্যার পরিবর্তন হয়ে থাকে। এই পরিবর্তনের হার স্থূল জন্মহার ও স্থূল মৃত্যুহার দ্বারা নির্ধারিত হয়। প্রতি বছর কোনো অঞ্চল বা দেশে প্রতি হাজার লোকের মধ্যে যে-সংখ্যক জীবিত শিশু জন্মগ্রহণ করে তাই সে অঞ্চল বা দেশের স্থূল জন্মহার। প্রতি বছর কোনো অঞ্চল বা দেশে প্রতি হাজার লোকের মধ্যে যে-সংখ্যক লোক মৃত্যুবরণ করে তাই সে অঞ্চলের স্থূল মৃত্যুহার। যখনই স্থূল জন্মহার স্থূল মৃত্যুহারের চেয়ে বেশি হয়ে যায় তখনই জনসংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

এক হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশে প্রতি বছর জন্ম নিচ্ছে ২৫ লক্ষ শিশু এবং মৃত্যুবরণ করছে সকল বয়সের প্রায় ৬ লক্ষ লোক। ফলে প্রতি বছর প্রায় ১৯ লক্ষ লোক বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রধান কারণ হলো একদিকে উচ্চ জন্মহার ও অন্যদিকে নিম্ন মৃত্যুহার।

মৃত্যুহার হ্রাস

মৃত্যুহার হ্রাস জনসংখ্যা বৃদ্ধির অন্যতম কারণ। পূর্বে পৃথিবীব্যাপী, বিশেষ করে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে শিশুমৃত্যুহার অধিক ছিল। হাম, পোলিও, ধনুষ্টংকার, ডিপথেরিয়া, হুপিংকাশি, যক্ষ্মা ইত্যাদি রোগে অনেক শিশুর মৃত্যু ঘটত। কিন্তু এ সমস্ত মারাত্মক রোগের প্রতিষেধক টিকা আবিষ্কার ও ব্যবহারের ফলে অনেক শিশু অকাল মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে যাচ্ছে। খাবার স্যালাইনের ব্যবহারের ফলে অনেক শিশু অকালমৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে যাচ্ছে। বর্তমানে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে শিশুমৃত্যুর হার অনেক কমে গেছে। মাতৃমঙ্গল কর্মসূচি হাতে নেওয়ার ফলে প্রসূতি মায়ের মৃত্যুর হারও কমে গেছে। কলেরা, বসন্ত, ম্যালেরিয়া ইত্যাদি সংক্রামক রোগ পূর্বে মহামারীরূপে দেখা দিত, হাজার হাজার লোক মৃত্যুবরণ করত। কিন্তু এখন প্রতিষেধক আবিষ্কার হওয়ায় মৃত্যুহার উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। ফলে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

তাছাড়া পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও চিকিৎসা শাস্ত্রের উন্নতির ফলে মানুষের গড় আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১১ সালে আমাদের দেশে মানুষের গড় আয়ু বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৬৯ বছর (উৎস ২০১১ সালের বিবিএস রিপোর্ট)। আয়ুষ্কালের এই বৃদ্ধি জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে প্রভাব বিস্তার করছে। শিক্ষা প্রসারের সাথে সাথে স্বাস্থ্য শিক্ষারও প্রসার ঘটেছে। মানুষ খাদ্যের পুষ্টিমান সম্পর্কে ধারণা লাভ করছে। সুষমখাদ্য গ্রহণের উপকারিতা বুঝতে পারছে। ফুটানো পানি এবং টিউবওয়েলের আর্সেনিকমুক্ত ও নিরাপদ পানীয় জলের ব্যবহার শিখেছে। জনগণ স্বাস্থ্যকর, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন দূষণমুক্ত পরিবেশে থাকার চেষ্টা করছে। ফলে রোগমুক্ত দীর্ঘ জীবনের অধিকারী হচ্ছে। এভাবে মৃত্যুহার ক্রমশ কমে যাচ্ছে। কিন্তু জন্মহারের খুব বেশি পরিবর্তন হচ্ছে না। ফলে দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাল্যবিবাহের কারণেও শিশু জন্মহার বৃদ্ধি পায়।

বসতি স্থানান্তর

জনসংখ্যা বৃদ্ধির আরেকটি উল্লেখযোগ্য কারণ হচ্ছে বসতি স্থানান্তর। দুই দেশের মধ্যে অধিবাসীদের স্থানান্তরকে দেশান্তর বলে। দেশান্তর দুইরকম-বহিরাগমন ও বহির্গমন। দেশের বাইরে থেকে দেশে লোকের আগমনকে বহিরাগমন বলে। বহিরাগমনের ফলে জনসংখ্যা বেড়ে যায়। কোনো দেশ থেকে লোকের অন্য দেশে গমনকে বহির্গমন বলে। বহির্গমনের ফলে জনসংখ্যা কমে যায়। কোনো দেশে বহির্গমনের চেয়ে বহিরাগমন বেশি হলে সে দেশের জনসংখ্যা বেড়ে যায়।

দেশের ভিতর অনেক সময় এক এলাকার লোক অন্য এলাকায় গিয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস করে। এটাকে বলে আন্তঃস্থানান্তর। এই অবস্থায় প্রথম এলাকার জনসংখ্যা কমে যায় ও দ্বিতীয় এলাকার জনসংখ্যা বেড়ে যায়। এভাবে বাসস্থান পরিবর্তন বা স্থানান্তরের জন্য বিভিন্ন এলাকার জনসংখ্যার পরিবর্তন ঘটে। যেমন-মনে কর, তোমরা কুমিল্লার বাসিন্দা ছিলে কিন্তু বর্তমানে সবাই ঢাকাতে স্থায়ীভাবে বসবাস করছ। এতে কুমিল্লার জনসংখ্যা কমে গেল এবং ঢাকার জনসংখ্যা বেড়ে গেল। তবে আন্তঃস্থানান্তরে দেশে মোট জনসংখ্যার কোনো পরিবর্তন হয় না। দেশের জনসংখ্যার বৃদ্ধি ঘটে তখনই যখন অন্য দেশ থেকে বহিরাগমন ঘটে।

অনুশীলনমূলক কাজ

কাজ-১ : বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের পর জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রবণতা একটি ছকে দেখাও।

কাজ-২ : জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ উল্লেখ কর।

পাঠ-৩ : জনসংখ্যা বৃদ্ধিজনিত সমস্যা

জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে নিম্নে বর্ণিত সমস্যাগুলো সৃষ্টি হয় :

ক. পরিবারের আয় অপরিবর্তিত থেকে জনসংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পেলে পরিবারে অসচ্ছলতা দেখা দেয়।

খ. নির্দিষ্ট আয়ের পরিবারে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে পরিবারের সদস্যদের মাথাপিছু আয় কমে যায়।

গ. সীমিত আয়ের পরিবারে জনসংখ্যা অধিক বৃদ্ধি পেলে পরিবারের জীবনযাত্রার মান হ্রাস পায়।

ঘ. পরিবারের জনসংখ্যার আধিক্যের কারণে অনেক সন্তানই শিক্ষার সুযোগ পায় না। কেননা সরকার বা সমাজের পক্ষে এরূপ দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যালয়ে সুযোগ বৃদ্ধি করা সম্ভব হয় না।

ঙ. নির্দিষ্ট আয়ের পরিবারে সন্তানের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য পুষ্টিকর খাদ্য ক্রয় করা সম্ভব হয় না। পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে সকলেই দুর্বল স্বাস্থ্যের অধিকারী হয়ে পড়ে।

জনসংখ্যা বৃদ্ধি জনিত সমস্যা সমাধানের উপায়

জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে পরিবার ও দেশে যে সকল সমস্যা দেখা দেয় তা সমাধানের প্রধান উপায় হলো–

প্রথমত, বাল্যবিবাহ রোধ করার জন্য বিয়ের ন্যূনতম বয়স নির্ধারণের যে আইন করা হয়েছে (পুরুষের জন্য ২১ বছর এবং মেয়েদের জন্য ১৮ বছর) তা পুরোপুরি কার্যকর করতে হবে।

দ্বিতীয়ত, নারী সমাজের জন্য বিভিন্ন ধরনের উৎপাদনমুখী কর্মের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। মহিলারা অধিক পরিমাণে উৎপাদনমুখী কাজকর্মে অংশগ্রহণ করলে স্বাভাবিকভাবেই জনসংখ্যা কমে যাবে।

তৃতীয়ত, শিক্ষা মানুষকে সমাজ সচেতন করে এবং জীবনযাত্রার উচ্চমান সম্পর্কে আগ্রহী করে। এজন্য আমাদের দেশে সর্বজনীন ও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন করা হয়েছে। এ কর্মসূচি আরো জোরদার করতে হবে।

চতুর্থত, ছেলেমেয়েদের শিক্ষাদান ও স্বাস্থ্য রক্ষার ব্যাপারে মা-বাবাকে সদা সচেতন থাকতে হবে। এই সচেতনতা আনার জন্য সামাজিকভাবে একটি কর্মসূচি গ্রহণ করা প্রয়োজন। এই কর্মসূচিতে গণশিক্ষা ও বয়স্ক শিক্ষার গুরুত্ব, স্বাস্থ্য রক্ষার প্রাথমিক ধারণা, পরিবার পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

পঞ্চমত, ছোট পরিবারের উপকারিতা সম্বন্ধে জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। ছোট পরিবারের সুযোগ সুবিধা যেমন-পুষ্টিকর ও পরিমিত খাদ্য, উপযুক্ত শিক্ষা, চিকিৎসার সুবিধা ইত্যাদি সম্পর্কে জনসাধারণকে অবহিত করতে হবে।

ষষ্ঠত, জনসংখ্যা দেশের জন্য সম্পদ হতে পারে, যদি জনসংখ্যাকে দক্ষ জনশক্তিতে রূপান্তর করা যায়। প্রবাসে আমাদের দেশের কয়েক লক্ষ লোক দক্ষ ও অদক্ষ শ্রমিক হিসেবে কাজ করছেন। তাছাড়া আমাদের দেশের বিভিন্ন পেশাজীবীও বিদেশে কর্মরত আছেন। তারা যে বিপুল পরিমাণ অর্থ দেশে প্রেরণ করছেন তা আমাদের বৈদেশিক অর্থ-উপার্জনের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে। তাছাড়া আমাদের দেশের জনসম্পদের একটি বড় অংশ আত্মকর্মসংস্থানের নানা উপায় উদ্ভাবন করে দেশের অর্থনীতিতে অবদান রাখছে। সুতরাং দেশের বিশাল জনসংখ্যা পরোক্ষভাবে আমাদের দেশের জনশক্তি হিসেবে অবদান রাখছে। তবে, মনে রাখা দরকার আমাদের দেশে জমির পরিমাণের তুলনায় জনসংখ্যা অত্যধিক বৃদ্ধি পেলে নানা সমস্যার সৃষ্টি হতে পারে। এদিকে লক্ষ রেখে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে রাখাই হবে বাঞ্ছনীয়।

অনুশীলনমূলক কাজ

কাজ- ১ : জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে সৃষ্ট সমস্যাগুলো উল্লেখ কর।

কাজ- ২ : আমাদের জনসংখ্যা কীভাবে জনসম্পদে পরিণত হতে পারে তা লেখ।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ১৯৭৪ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী বাংলাদেশের জনসংখ্যা কত ছিল?

ক. ৪.২০ কোটি খ. ৫.২৮ কোটি

গ. ৫.৫২ কোটি ঘ. ৭.৬৪ কোটি

২. বাংলাদেশে মৃত্যুহার হ্রাসের কারণগুলো হলো–

i. শিক্ষার হার বৃদ্ধি

ii. চিকিৎসা সেবার উন্নতি

iii. খাদ্যের পুষ্টিমান সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

ফওজিয়া একজন সমাজকর্মী। তিনি নয়নপুর গ্রামে দীর্ঘ পাঁচ বছর যাবত উন্নয়ন কর্মকাণ্ড চালিয়ে আসছেন। সম্প্রতি এক জরিপে দেখা যায় নয়নপুর গ্রামে গত এক বছরে ৫০ জন শিশু জন্মগ্রহণ করে এবং বিভিন্ন কারণে ৫ জন শিশু মৃত্যুবরণ করে।

৩. নয়নপুর গ্রামে দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ কী?

ক. উচ্চ জন্মহার ও নিম্ন মৃত্যুহার খ. জন্মহার ও মৃত্যুহার সমান

গ. নিম্ন জন্মহার ও উচ্চ মৃত্যুহার ঘ. উচ্চ জন্মহার ও উচ্চ মৃত্যুহার

৪. নয়নপুর গ্রামে জনসংখ্যা সমস্যা সমাধানের উপায় হচ্ছে–

i. বাল্যবিবাহ রোধ

ii. জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন

iii. জনসংখ্যার বর্হিরাগমন

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. সারণিটি পড় এবং নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রবণতা	
১৯৬১	৫.৫২ কোটি
১৯৭৪	৭.৬৪ কোটি
১৯৯১	১১.১৫ কোটি
২০০১	১২.৯৩ কোটি
২০০৭	১৪.০৬ কোটি

ক. বাংলাদেশে মেয়েদের বিয়ের ন্যূনতম বয়স কত?

খ. বসতি স্থানান্তর কীভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে–ব্যাখ্যা কর।

গ. ১৯৬১ সালের তুলনায় ২০০৭ সালের জনসংখ্যা তিনগুণ বৃদ্ধির কারণ ব্যাখ্যা কর।

ঘ. '১৯৯১ সালের পর থেকে বাংলাদেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে'– পাঠ্যপুস্তকের আলোকে উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।

২. ঘটনা-১

সফল ব্যবসায়ী হিসেবে চৌধুরী পরিবার ও হালদার পরিবার সিলেটের কুলাউড়া এলাকার অনেকের কাছেই পরিচিত। অথচ চৌধুরীদের আদিনিবাস কিশোরগঞ্জে এবং হালদার পরিবারের মূলবাড়ি ব্রাহ্মণবাড়িয়ায়।

ঘটনা-২

সৈয়দপুর, সোহাগীসহ পাশাপাশি তিন-চারটি গ্রামের অনেক লোক পরিবারসহ প্রায় ১৫ বছর যাবত মধ্যপ্রাচ্যে বসবাস করছেন। তাদের ছেলেমেয়েদের অনেকেই এখনও পূর্ব পুরুষদের জন্মস্থান দেখেনি।

ক. স্থূল জন্মহার কাকে বলে?

খ. বাংলাদেশের মানুষের গড় আয়ুষ্কাল বৃদ্ধির একটি কারণ ব্যাখ্যা কর।

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ঘটনা-১ কোন ধরনের স্থানান্তরকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'ঘটনা-২ এ উল্লিখিত স্থানান্তরটি দেশের জনসংখ্যা হ্রাসের মুখ্য কারণ।' বক্তব্যটিকে তুমি কি সমর্থন কর? উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও।

অধ্যায়-আট

বাংলাদেশে নারী অধিকার

পাঠ-১: সমাজে নারীর ভূমিকা

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক হলো নারী। সমাজের এই অর্ধেক অংশকে অধিকারবঞ্চিত বা পেছনে ফেলে রেখে সমাজের উন্নতি বা দেশকে এগিয়ে নেওয়া সম্ভব নয়। বেগম রোকেয়া পুরুষ ও নারীকে তুলনা করেছেন একটি গাড়ির দুটি চাকার সঙ্গে। গাড়ির একটি চাকা বড় ও একটি চাকা ছোট হলে সে গাড়ি যেমন ঠিকভাবে সামনে এগোতে পারে না, সমাজের বেলায়ও তেমনি। নারীরা কেবল সমাজের অর্ধেকই নয়, কিংবা তারা শুধু মা, বোন, ভাবি, চাচি, ফুফু, খালা, দাদি, নানিরই ভূমিকা পালন করেন না, পরিবারের পুরুষ সদস্যের অনুপস্থিতিতে সংসার পরিচালনার দায়িত্বও তারাই পালন করেন। সন্তান লালনের প্রধান দায়িত্বটা নারীই পালন করেন। এভাবে জাতির ভবিষ্যৎ তাদের হাতেই গড়ে উঠে।

বাংলাদেশের সমাজে নারীর অবস্থান

নানা দিক থেকেই বাংলাদেশের নারীরা পুরুষের তুলনায় পিছিয়ে আছে। অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক অনেক অধিকার থেকেই তারা আজও বঞ্চিত। বিভিন্ন বৈষম্য-বঞ্চনারও শিকার হতে হয় তাদেরকে। আমাদের দেশে এখনও অনেক পিতা-মাতা কন্যা-শিশুকে বোঝা হিসেবে গণ্য করে। তারা মনে করে পুত্র বড় হয়ে বাবা-মাকে উপার্জন করে খাওয়াবে, সংসারের হাল ধরবে। অন্যদিকে কন্যা বিয়ের পর স্বামী বা শ্বশুর বাড়ি চলে যাবে, উপরন্তু তাকে বিয়ে দিতে গিয়ে পিতা-মাতাকে অনেক টাকা খরচ করতে হবে। এই মনোভাব থেকেই তারা পুত্র-সন্তানকে কন্যা-সন্তানের চেয়ে অধিক গুরুত্ব দেয়। যদিও বর্তমানে অবস্থাটা বদলাচ্ছে। মেয়েরাও ছেলেদের মতো সমানভাবে বাবা-মা, পরিবার ও সমাজের দায়িত্ব নিতে এগিয়ে আসছে। একইভাবে নারীর প্রতি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গিরও ধীরে ধীরে হলেও পরিবর্তন ঘটছে। তবে শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে পিছিয়ে থাকায় এবং ধর্মীয় ও সামাজিক নানা কুসংস্কারের ফলে সমাজে নারীকে তার প্রাপ্য অধিকার দিতে অনেকেই এখনও প্রস্তুত নয়। আমাদের সংবিধানে, সরকারি বিধি-বিধানে নাগরিক হিসেবে নারীকে পুরুষের পাশাপাশি সমান অধিকার দেওয়া হয়েছে। চাকরি বা অন্যান্য পেশা এবং মজুরির ক্ষেত্রেও তাদের অধিকার সমান। কিন্তু বাস্তব জীবনে অনেকক্ষেত্রেই নারীদের এসব অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখা হয়। পরিবারে ও সমাজে তারা নানা রকম বৈষম্য-বঞ্চনার শিকার হয়। ছেলে-সন্তানদের লেখাপড়ার ব্যাপারে পরিবার যতটা আগ্রহ দেখায়, মেয়েদের বেলায় তা দেখায় না। বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে কম বয়সেই মেয়েদের বিয়ে দিয়ে দেওয়া হয়। ফলে ভালো ছাত্রী হয়েও মেয়েরা অনেক সময় প্রাথমিক বা মাধ্যমিক স্তরের বেশি পড়ালেখার সুযোগ পায় না। এছাড়া নারীদের উপর শারীরিক-মানসিক নির্যাতনের ঘটনা তো আছেই। প্রতিদিনের পত্রিকার পাতায় আমরা নারী নির্যাতনের নানা খবর দেখতে পাই।

অনুশীলনমূলক কাজ

কাজ- ১ : সমাজে নারীর ভূমিকা কেন গুরুত্বপূর্ণ তা আলোচনা কর ।

পাঠ-২: বাংলাদেশে নারীর অধিকার

বাংলাদেশের সংবিধানে নারী-পুরুষের সমানাধিকারের স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। নারীর প্রতি বৈষম্য বিলোপ সংক্রান্ত জাতিসংঘ সনদেও নারীর এই সমানাধিকারের কথা বলা হয়েছে। এখানে সমানাধিকার বলতে পরিবারে, সমাজে, রাষ্ট্রে অর্থাৎ জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে পুরুষের পাশাপাশি নারীর সমান অধিকারের কথা বোঝানো হচ্ছে। শুধু ভোট প্রদান বা নির্বাচনে দাঁড়াবার সুযোগের বেলায়ই পুরুষ ও নারী যে সমান তা নয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়ালেখা, চাকরি বা কর্মসংস্থান, বেতন বা মজুরি সব ব্যাপারেই নারী ও পুরুষ সমান সুযোগ লাভের অধিকারী। কোনো অবস্থায়ই নারীর প্রতি কোনো বৈষম্য করা যাবে না।

নারীর প্রতি বৈষম্য দূর ও তার সমানাধিকার নিশ্চিত করতে সরকার কতগুলো বিশেষ ব্যবস্থা নিয়েছে। যেমন উচ্চমাধ্যমিক শ্রেণি পর্যন্ত মেয়েদের বিনা বেতনে লেখাপড়ার সুযোগ ও তাদের জন্য উপবৃত্তির ব্যবস্থা। সন্তানের নামের সঙ্গে আগে যেখানে শুধু বাবার নাম লেখার নিয়ম ছিল, সেখানে মায়ের নাম লেখাও বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। নারী নির্যাতন ও এসিড সন্ত্রাস রোধে সরকার কঠোর আইন প্রবর্তন করেছে। নারীর মাতৃত্বকালীন ছুটির সময় বাড়ানো হয়েছে। এসব ব্যবস্থার কিছু ফল নারীরা পেতে শুরু করেছে। তবে সমাজে শিক্ষার বিস্তার ও সচেতনতা সৃষ্টি ছাড়া অবস্থার পুরোপুরি পরিবর্তন হয়তো ঘটবে না। কিন্তু বাংলাদেশের নারীরা যে ভাবে তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠছে সেটা স্পষ্ট। বিভিন্ন সভা-সমিতি-সংগঠনে তাদের অংশগ্রহণই তার বড় প্রমাণ।

অনুশীলনমূলক কাজ

কাজ- ১ : আমাদের সমাজে নারীর অধিকার অর্জনের পথে প্রধান বাধাগুলো চিহ্নিত কর।

কাজ-২ : নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা ও তাদের অবস্থার উন্নয়নে সরকারের গ্রহণ করা কয়েকটি পদক্ষেপের উল্লেখ কর ।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার কতভাগ নারী?

ক. প্রায় অর্ধেক খ. এক-চতুর্থাংশ

গ. দুই-তৃতীয়াংশ ঘ. তিন-চতুর্থাংশ

২. জাতির ভবিষ্যৎ নারীর হাতেই গড়ে উঠে কারণ, নারী –

i . মা, বোন, ভাবী, চাচি, দাদির ভূমিকা পালন করে

ii. সন্তান-সন্ততি লালন পালন করে

iii. সংসার পরিচালনা করে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

রেজিনা তার স্বামীকে ছেলে-মেয়েদের জন্য খেলনা আনতে বলেন। বাজার থেকে তার স্বামী ছেলের জন্য ক্রিকেট বল ও ব্যাট এবং মেয়ের জন্য পুতুল ও হাড়ি-পাতিল কিনে আনলেন।

৩. রেজিনার স্বামীর খেলনা ক্রয়ের ঘটনা ছেলে-মেয়ের প্রতি যে ধরনের আচরণের প্রকাশ পেয়েছে তাহলো–

i. অর্থনৈতিক বৈষম্য
ii. দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য
iii. আদরের পার্থক্য

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii ও iii
গ. ii ঘ. i, ii ও iii

৪. উক্ত বৈষম্যের কারণে শিশুর কোন দিকটি অধিক বাধাগ্রস্ত হচ্ছে–

ক. নিরাপদে বেড়ে উঠা খ. স্বাস্থ্য সুরক্ষা
গ. শিক্ষা গ্রহণ করা ঘ. সঠিক মানসিক বিকাশ

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. স্বামী এবং তিন সন্তান নিয়ে হাফিজার সংসার। স্বামীর একক আয়ে তার সংসার চলে না। সংসারের অভাব পূরণে হাফিজা নির্মাণ শ্রমিকের কাজ নেয়। সপ্তাহ শেষে মজুরি গ্রহণের সময় মালিক তাকে দৈনিক ১০০ টাকা হারে মজুরি দেয়। অথচ একই কাজের জন্য পুরুষ শ্রমিকদের ১৫০ টাকা হারে দৈনিক মজুরি দেয়। সে এর প্রতিবাদ করলে মালিক তাকে কাজে আসতে নিষেধ করে।

ক. বেগম রোকেয়া নারী ও পুরুষকে কিসের সঙ্গে তুলনা করেছেন?

খ. সংসার-জীবনে নারীর প্রধান ভূমিকা বর্ণনা কর।

গ. হাফিজা কোন ধরনের বৈষম্যের শিকার হয়েছেন? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. হাফিজার মতো নারীদের অধিকার আদায়ে করণীয় বিষয়ে মতামত দাও।

অধ্যায়-নয়

বাংলাদেশের প্রবীণ ব্যক্তির অধিকার

পাঠ-১ : সমাজে প্রবীণদের অবস্থান

জীবনের নিয়মে সব মানুষই এক সময় প্রবীণ অর্থাৎ বুড়ো হয়। আর বুড়ো বয়সে শারীরিক দুর্বলতার সঙ্গে সঙ্গে সমাজ-সংসারে মানুষ নানা রকম সমস্যা বা অসুবিধার সম্মুখীন হয়। এই সমস্যা পারিবারিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, মনস্তাত্ত্বিক। উপার্জন করার সামর্থ্য না থাকায় অনেক সময় পরিবারে বুড়ো মানুষের গুরুত্ব কমে যায়। তারা নানা রকম অবহেলা বা উপেক্ষার শিকার হয়। আয়ের অভাবে জীবনধারণ করা, নিজের আশ্রয় ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা তাদের পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে। এজন্য তাদেরকে অন্যের উপর নির্ভর করতে বা অন্যের কাছে হাত পাততে হয়। এটা তাদের মধ্যে এক রকম হীনম্মন্যতারও সৃষ্টি করে। পৃথিবীর উন্নত দেশগুলোতে রাষ্ট্র বা সরকার প্রবীণদের জন্য নানা রকম সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করে। আমাদের দেশেও বর্তমানে প্রবীণদের সমস্যা ও তাদের অধিকারের বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা হচ্ছে।

আমাদের সবারই পরিবারে ও আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে প্রবীণ কেউ না কেউ আছেন। পাড়া-প্রতিবেশীদের মধ্যে কিংবা রাস্তায় বেরুলেও আমরা অনেক প্রবীণ লোককে দেখতে পাই। চলাফেরায়, রাস্তা পেরুতে, যানবাহনে উঠতে তাঁদের অসুবিধাগুলো আমরা নিশ্চয় বুঝতে পারি। এই প্রবীণরা সব সময় প্রবীণ ছিলেন না। এক সময় তাঁরা পরিবার ও সমাজের জন্য অনেক কিছু করেছেন। আজ বৃদ্ধ বয়সে তাঁদের প্রতিও সমাজের কিছু দায়িত্ব বা কর্তব্য রয়েছে। এ প্রসঙ্গে আমরাও যে একদিন বৃদ্ধ হব সে-কথাটাও আমাদের মনে রাখা দরকার। বয়স বা অসুখ-বিসুখের কারণে কাজ করার সামর্থ্য কমে এলেও, প্রবীণরা তাঁদের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা দিয়ে আমাদের সাহায্য করতে পারেন। সেদিক থেকে তাঁরা অন্য যে-কোনো বয়সের মানুষের মতোই সমাজের সম্পদ। মূল্যবান মানবসম্পদ। অন্যান্য নাগরিক অধিকারের পাশাপাশি সমাজে প্রবীণদের জন্য কিছু বিশেষ অধিকার থাকা দরকার। যেমন নারী, শিশু ও সমাজের অন্যান্য অংশের মানুষের জন্যও কিছু বিশেষ অধিকার থাকে। তবে সবার আগে প্রবীণদের প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটাতে হবে। পরিবারে ও সমাজে তাঁদেরকে অপ্রয়োজনীয় বা বোঝা হিসেবে গণ্য করার মানসিকতা বদলাতে হবে।

আমাদের দেশে সাধারণত ষাটোর্ধ্ব বয়সের মানুষকে প্রবীণ বলে গণ্য করা হয়। কারণ ঐ বয়সের পর মানুষ দৈনন্দিন জীবিকা উপার্জনের কাজ থেকে অবসর নেয়। বাংলাদেশে সরকারি চাকরি থেকে অবসরের বয়স ৫৯ বছর। বিচারপতি, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও কোনো কোনো পেশাজীবীদের জন্য বয়সের এই সীমা সম্প্রতি ৬৫ বছর পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। যদিও ঐ বয়সের পরও যে সব মানুষ তার কাজ করার সামর্থ্য হারিয়ে ফেলে তা নয়। তবে বিশ্বের উন্নত দেশগুলোতেও ৬০ বা ৬৫ বছর বয়সের পর একজন মানুষকে প্রবীণ বা 'সিনিয়র সিটিজেন' গণ্য করা হয়। সমাজে তাঁদেরকে বিশেষ

সম্মান ও সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হয়। জাতিসংঘ প্রবীণ জনগোষ্ঠীর অধিকার রক্ষায় কতিপয় নীতিমালা প্রণয়ন করেছে। এছাড়াও জাতিসংঘ প্রবীণদের অধিকার ও তাঁদের প্রতি কর্তব্য সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করতে একটি বিশেষ দিনকে 'প্রবীণ দিবস' হিসেবে ঘোষণা করেছে।

অনুশীলনমূলক কাজ

কাজ- ১ : প্রবীণ কারা? প্রবীণদের কেন সম্মান করা উচিত– লেখ।

পাঠ-২ : প্রবীণদের সমস্যা

আমাদের সমাজে প্রবীণদের সাধারণত যেসব সমস্যার মোকাবেলা করতে হয় সেগুলো হলো :

(ক) পারিবারিক : আমাদের দেশে এক সময় পরিবারগুলো ছিল একান্নবর্তী। সে-সময় পরিবারে প্রবীণদের এক ধরনের কর্তৃত্ব বা মুরুব্বিস্থানীয় ভূমিকা ছিল। কিন্তু শিল্পায়ন, নগরায়ন ও মানুষের অর্থনৈতিক জীবনধারার পরিবর্তনের ফলে একান্নবর্তী পরিবারগুলো ভেঙে গিয়ে ছোট ছোট পরিবারে পরিণত হচ্ছে। স্বামী-স্ত্রী, ছেলেমেয়ে ও বড়জোর কাজের লোক নিয়ে এই পরিবার ব্যবস্থায় বৃদ্ধ বাবা-মা বা শ্বশুর-শাশুড়ির স্থান থাকছে না, কিংবা তাঁরা কোণঠাসা হয়ে বাস করছেন। তাঁদের দেখাশুনা বা অসুখ-বিসুখে সেবাযত্নের লোকের অভাব ঘটছে। তাঁদেরকে সঙ্গ দেওয়ার বা তাঁদের সঙ্গে গল্পগুজব করার লোক থাকছে না। ফলে তাঁরা এক ধরনের নিঃসঙ্গতা ও বিমর্ষতার শিকার হচ্ছেন। অনেকক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রী উভয়েই কর্মজীবী হওয়ায় শিশুদের দেখাশুনা, স্কুলে পৌঁছানো, বাজারঘাট করা ও গৃহস্থালি কাজের দায়িত্বও পরিবারের প্রবীণ সদস্যদের উপর পড়ে। বৃদ্ধ বয়সে অনেক সময়ই এ-সব কাজ করা তাঁদের পক্ষে কঠিন হয়। বৃদ্ধদের অনেক সময় পরিবারের বোঝা হিসেবে গণ্য করা হয়।

(খ) অর্থনৈতিক : নিজস্ব আয়-রোজগারের সুযোগ না থাকায় এবং সঞ্চিত অর্থ ও সম্পত্তিও উত্তরাধিকারীদের মধ্যে বণ্টিত হয়ে যাওয়ায় বেশিরভাগ প্রবীণই অর্থনৈতিকভাবে অসহায় হয়ে পড়েন। তাঁদেরকে সন্তানদের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়তে হয়। নিজের ইচ্ছেমতো তাঁরা কিছুই করতে পারেন না। বিশেষ করে মধ্যবিত্ত বা দরিদ্র পরিবারের প্রবীণদের দুর্দশা এক্ষেত্রে বেশি হয়। বার্ধক্যে পৌঁছবার আগেই সংসার চালাতে এবং সন্তানদের লেখাপড়া ও মেয়েদের বিয়ের খরচ যোগাতে গিয়ে অনেকেই প্রায় নিঃস্ব হয়ে পড়েন। বন্যা ও জলোচ্ছ্বাসের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও নদী ভাঙনের ফলেও অনেকে সর্বস্বান্ত হয়ে যান। এ অবস্থায় যথেষ্ট রোজগার বা সামর্থ্যের অভাবে ছেলেমেয়েদের পক্ষেও প্রবীণ বাবা-মার ভার বহন করা কঠিন হয়ে পড়ে। ইচ্ছে থাকলেও তারা তাঁদের ঠিকমতো সেবাযত্ন করতে পারে না।

(গ) শারীরিক : প্রবীণ বয়সে মানুষের শারীরিক শক্তি কমে আসে। নানা রোগব্যাধি শরীরে বাসা বাঁধে। এ সময় মানুষের একটু বিশ্রাম বা আরামের প্রয়োজন হয়। কিন্তু আমাদের দেশের অনেক প্রবীণেরই এই আরামটুকু জোটে না। অসুস্থ অবস্থায় প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সুবিধাটুকুও তাঁরা পান না। রোগব্যাধিতে ঔষধপথ্য কেনার সামর্থ্য তাঁদের থাকে না।

(ঘ) সামাজিক-সাংস্কৃতিক : এক সময় আমাদের দেশে প্রবীণদের প্রতি যে-ধরনের সম্মান দেখানো হতো বা তাদের মতামতকে যতটা গুরুত্ব দেওয়া হতো, আজ আর তা দেখা যায় না। এর পেছনে সমাজে মূল্যবোধের বিপর্যয়, নৈতিক শিক্ষার অভাব, বিদেশি সংস্কৃতির প্রভাব, আত্মকেন্দ্রিক মনোভাবের প্রসার ইত্যাদি অনেক কারণ কাজ করছে। পরিবারে ও সমাজে প্রবীণদের আজ প্রায় অপ্রয়োজনীয় বিবেচনা করা হয়। তাঁদের মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া হয় না। তাঁদের পাশে একটু বসে দুটো কথা শোনার সময়ও যেন কারও নেই। অবসর যাপন বা চিত্তবিনোদনের সুযোগও তাঁদের নেই বললেই চলে।

(ঙ) মনস্তাত্ত্বিক: পরিবারে ও সমাজে প্রবীণদের কোণঠাসা অবস্থা তাঁদের মধ্যে এক ধরনের হীনম্মন্যতার জন্ম দেয়। তাঁরা নিজেদেরকে খুব অবহেলিত ও অসহায় ভাবতে শুরু করেন। নিজস্ব সহায়-সামর্থ্যের অভাব এবং সেই সঙ্গে শারীরিক অসুস্থতা ও নিঃসঙ্গতা এই হীনম্মন্যতাকে আরও বাড়িয়ে তোলে। প্রবীণ বয়সের স্মৃতিবিভ্রমও এক্ষেত্রে বাড়তি সমস্যা সৃষ্টি করে।

অনুশীলনমূলক কাজ

কাজ- ১ : প্রবীণদের সমস্যাগুলো উল্লেখ কর ।

কাজ- ২ : তোমার পরিচিত কোনো প্রবীণ ব্যক্তি যেসব সমস্যার সম্মুখীন হন তার বিবরণ দাও।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. বাংলাদেশে সরকারি চাকরি থেকে কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের অবসর গ্রহণের বয়স কত ?

ক. ৫৭ বছর খ. ৬৯ বছর

গ. ৬০ বছর ঘ. ৬৫ বছর

২. আমাদের সমাজে প্রবীণদের সমস্যার কারণ–

i . তাদের উপার্জনের সামর্থ্য নেই

ii. সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়

iii. সমাজে নৈতিক শিক্ষার অবনতি

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. i ও iii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও–

সলিম গাজী একসময় এলাকায় প্রভাবশালী ছিলেন। পরিবারেও ছিল তার একচ্ছত্র নিয়ন্ত্রণ। কিন্তু বর্তমানে বৃদ্ধ হওয়াতে প্রায়ই অসুস্থ থাকেন। তাই এলাকাবাসীও তাকে গুরুত্ব দেয় না। তার অর্থ উপার্জন কমে যাওয়ায় পরিবারের সদস্যরাও তাকে কম মূল্যায়ন করে। সবাই নিজের কাজে ব্যস্ত থাকে। সহায়-সম্বল, প্রভাব প্রতিপত্তি হারিয়ে তিনি এখন হীনম্মন্যতা ও নিঃসঙ্গতায় ভুগছেন।

৩. সলিম গাজীর হীনম্মন্যতা ও নিঃসঙ্গতার কারণ হলো–

i. শারীরিক

ii. অর্থনৈতিক

iii. মনস্তাত্ত্বিক

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii

গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৪. সলিম গাজীর সমস্যা সমাধানের করণীয় হচ্ছে–

ক. পারিবারিক ও সামাজিক সহানুভূতি

খ. অর্থনৈতিক নির্ভরতা সৃষ্টি করা

গ. শারীরিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করা

ঘ. সামাজিক পদমর্যাদা প্রদান করা

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. রেজা সাহেবের বয়স ৭০ বছর। তিনি কোমরের ব্যথার কারণে চলাফেরা করতে পারেন না। উন্নত চিকিৎসার জন্য তিনি তার স্ত্রীকে নিয়ে দেশ ছেড়ে আমেরিকায় প্রবাসী ছেলের কাছে আশ্রয় নেন। কয়েক বছর পর ঐ দেশে অর্থনৈতিক মন্দা দেখা দিলে তার ছেলের পক্ষে বাবা-মার খরচ বহন কষ্টকর হয়ে পড়ে। এরই মধ্যে তিনি গ্রীনকার্ড পেয়ে যান। তাতে ছেলের বাসা ছেড়ে তিনি স্ত্রীকে নিয়ে আলাদা বাসায় উঠেন এবং সরকার তাঁর চিকিৎসার খরচ যোগান দেয়।

ক. প্রবীণ কারা?

খ. প্রবীণদের মতামতকে গুরুত্ব দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা কর।

গ. রেজা সাহেব তার সন্তানদের বাসায় অবস্থানের ক্ষেত্রে কোন ধরনের সমস্যায় পড়েন ? পাঠ্যবইয়ের আলোকে ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'রেজা সাহেবের মতো প্রবীণদের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় সুযোগ সুবিধার গুরুত্ব অপরিসীম' – এ বক্তব্যের যথার্থতা বিশ্লেষণ কর।

অধ্যায়-দশ

বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যা

বাংলাদেশের সমাজ জীবনে নানারকম সমস্যা রয়েছে। এদের মধ্যে কয়েকটি সামাজিক সমস্যা হচ্ছে দারিদ্র্য, জনসংখ্যা স্ফীতি, নিরক্ষরতা, কুসংস্কার ও যৌতুক প্রথা। এসব সামাজিক সমস্যার ফলে দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। এসব সমস্যার প্রতিরোধ ও প্রতিকার প্রয়োজন। এজন্য ব্যাপক সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা প্রয়োজন এবং প্রচলিত আইনের যথাযথ প্রয়োগ দরকার।

পাঠ- ১ : বাংলাদেশে যৌতুক প্রথা

আমাদের দেশের নানা সামাজিক সমস্যার অন্যতম হচ্ছে যৌতুক প্রথা। এদেশের বিবাহ সংক্রান্ত আইনে যৌতুক আদান প্রদান নিষিদ্ধ। তবু অধিকাংশ বিয়েতে বরপক্ষ কনেপক্ষের কাছ থেকে যৌতুক গ্রহণ করে।

বিয়ের সময় বর বা কনে বিপরীত পক্ষের কাছ থেকে যে অর্থ বা সম্পত্তি দাবি করে ও গ্রহণ করে তাকেই বলা হয় যৌতুক। বর্তমানে বাংলাদেশে প্রায় সব ক্ষেত্রেই বরপক্ষ কনেপক্ষের কাছ থেকে যৌতুক দাবি করে। যৌতুক ছাড়া প্রায় কোনো বিয়েই হয় না। এটি একটি সামাজিক কুপ্রথায় পরিণত হয়েছে।

যৌতুক একটি প্রাচীন প্রথা। প্রাচীন চীনে বিয়ের পর কনে স্বামীর ঘরে যৌতুক সঙ্গে নিয়ে যেতো। এথেন্সেও বিয়ের পর কনে স্বামীর ঘরে নিয়ে যেতো অর্থ-সম্পত্তি। সেখানে যৌতুক গ্রহণকে সামাজিক মর্যাদা হিসেবে দেখা হতো। বর্তমান বাংলাদেশে যৌতুক হচ্ছে বিয়ের সময় বরকে প্রদত্ত অর্থ, সম্পত্তি ও নানা ধরনের মূল্যবান আসবাব ও সরঞ্জাম। তবে বাংলাদেশের বিবাহ আইনে যৌতুক দেওয়া ও নেওয়া দুটোই নিষিদ্ধ।

বাংলাদেশের সকল সমাজেই যৌতুক প্রথার কমবেশি প্রচলন আছে। যৌতুকের কারণে সমাজ-জীবনে নানা সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। বিবাহিত নারীর প্রতি অত্যাচার ও সহিংসতার মূল কারণ যৌতুক। যৌতুকের কারণে স্বামীর সংসারে স্ত্রীকে নিগ্রহ ভোগ করতে হয়। যৌতুকের দাবি পূরণ করতে না পারলে অনেক ক্ষেত্রেই স্ত্রীকে সংসার ছাড়তে বাধ্য করা হয়। যৌতুকের কারণেই বিবাহবিচ্ছেদ ও কখনও কখনও স্ত্রীর প্রাণহানির ঘটনাও ঘটে।

বাংলাদেশে যৌতুক প্রথা একটি মারাত্মক সামাজিক ব্যাধি। এর পেছনে নানা কারণ রয়েছে। তবে দারিদ্র্যের কারণেই এ সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে বলে মনে করা হয়। দারিদ্র্যের কারণেই বরপক্ষ কনেপক্ষের কাছে অর্থ-সম্পদ দাবি করে। কনের পিতার অর্থ-সম্পদ ব্যবহার করেই বর প্রতিষ্ঠা লাভ করতে চায়। এদেশের অধিকাংশ নারী কেবল গৃহকর্মেই নিযুক্ত থাকে। ঘরের সব কাজ করলেও তার কোনো অর্থ রোজগার হয় না। তারা স্বামীর সংসারে পরনির্ভরশীল জীবনযাপন করে। এ ধরনের নারীরাই অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্বামীর নিগ্রহ ও নির্যাতন ভোগ করে।

বাংলাদেশের অনেক সম্পদশালী মানুষ তাদের কন্যার বিয়েতে বিপুল অঙ্কের যৌতুক দেয়। ধনী পিতা-মাতার ধারণা যৌতুকের কারণে তাদের কন্যা স্বামীর ঘরে মাথা উঁচু করে থাকবে। এ কারণেও যৌতুক প্রথা সমাজমানসের গভীর মূলে বাসা বেঁধেছে।

আমাদের দেশে যৌতুক নিরোধের জন্য আইন রয়েছে। অনেক সময় এ আইনের যথাযথ প্রয়োগ না হওয়ায় যৌতুকের দাবিকে কেন্দ্র করে স্ত্রীর উপর নির্যাতন বাড়ছে। যৌতুকের জন্যই বিয়ের পর দাম্পত্য কলহ, নির্যাতন, স্ত্রীহত্যা ও বিবাহ-বিচ্ছেদের ঘটনা ঘটছে। সমাজে দারিদ্র্য, দুর্নীতি, অপরাধ প্রবণতা, বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহের মূলে রয়েছে এই যৌতুক সমস্যা। আমাদের মনে রাখা প্রয়োজন যে যৌতুক দেওয়া ও নেওয়া দুই-ই সমান অপরাধ।

অনুশীলনমূলক কাজ

কাজ- ১ : যৌতুক সম্পর্কে তোমার ধারণা নিজের ভাষায় লেখ।

কাজ- ২ : যৌতুকের কারণে সমাজে কী কী অপরাধ ঘটে তা লেখ।

পাঠ- ২ : যৌতুক নিরোধ আইন

মুসলিম পারিবারিক আইনে বিয়ের মোহরানাকে যৌতুক হিসেবে গণ্য করা হয় না। এছাড়া, বিয়ের সময় ৫০০ টাকা পর্যন্ত উপহার দিলে তা যৌতুক হিসেবে গণ্য হবে না। কিন্তু বর্তমানে বিয়ের ক্ষেত্রে যৌতুকের আদান-প্রদানের ঘটনা অনেক বেড়ে গেছে। এ জন্যেই যৌতুক বন্ধ করার জন্য বাংলাদেশে ১৯৮০ সালে যৌতুক নিরোধ আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। এ আইন অনুযায়ী যৌতুক প্রদান বা গ্রহণ করলে সর্বোচ্চ ১ বছরের কারাদণ্ড বা পাঁচ হাজার টাকা অর্থদণ্ড হতে পারে। বিচারক অপরাধীকে একসঙ্গে উভয় দণ্ড দিতে পারেন। যৌতুক আদান-প্রদানে সহায়তাকারীও একই শাস্তি পাবে।

১৯৮৬ সালে যৌতুক নিরোধ আইন সংশোধন করা হয়েছে। সংশোধিত আইন অনুযায়ী যৌতুক প্রদান বা গ্রহণ করলে অপরাধী সর্বনিম্ন ১ বছর এবং সর্বোচ্চ ৫ বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবে। ১৯৮৩ সালের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের বিধান অনুযায়ী যৌতুকের কারণে নির্যাতন করে নারীর মৃত্যু ঘটালে বা মৃত্যু ঘটানোর চেষ্টা করলে অপরাধীকে মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করা যাবে। নারীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিয়ে ও যৌতুক গ্রহণের জন্যও কঠিন শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে।

যৌতুক প্রথা বাংলাদেশের পরিবার ও সমাজ জীবনে ব্যাপক সমস্যার সৃষ্টি করেছে। এ প্রথার কুফল থেকে মুক্ত হতে হলে আমাদের সচেতন হতে হবে। যৌতুক প্রতিরোধ করার জন্য প্রথমেই সচেতন করতে হবে পরিবারকে। যৌতুক দেওয়া ও নেওয়া থেকে নিজেদের বিরত থাকতে হবে। একই সঙ্গে আমাদের প্রতিবেশীকেও এ বিষয়ে সচেতন করতে হবে। প্রয়োজন হলে গ্রহণ করতে হবে আইনের আশ্রয়।

পরিবারের কন্যা সন্তানসহ সবাইকে উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা দরকার। তারা আত্মনির্ভরশীল হলে যৌতুকের অভিশাপ তাদের স্পর্শ করতে পারবে না।

যৌতুকের হাত থেকে মুক্তি পেতে চাইলে পরিবারের সঙ্গে সমাজের সবাইকে সচেতন করে তুলতে হবে। এ জন্যে যৌতুক বিরোধী সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা দরকার।

সামাজিক আন্দোলন হচ্ছে সংগঠিত সামাজিক প্রতিরোধ। অশিক্ষা, দারিদ্র্য, নারী নির্যাতন, নারী অপহরণ ও বিবাহ বিচ্ছেদ – এসব ঘটনা আমাদের চারপাশে প্রতিদিন ঘটে চলেছে। এসব ঘটনার অধিকাংশের পেছনে রয়েছে যৌতুকের দাবি। আমাদের প্রতিবেশী এবং পাড়া-মহল্লা-গ্রামের মানুষকে যৌতুকের কুফল সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে হবে। এই কুপ্রথা প্রতিরোধ করার জন্য সবাইকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাতে হবে। সমাজের সব মানুষের মধ্যে সৃষ্টি করতে হবে যৌতুকবিরোধী মনোভাব।

যৌতুকবিরোধী সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য শিক্ষিত মানুষ, আইনজীবী, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্য এবং স্থানীয় উন্নয়ন কর্মীদের সহায়তা গ্রহণ করা দরকার। সবাই মিলে একটি যৌতুকবিরোধী সংগঠন গড়ে তুললে এই সামাজিক সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে। এই সংগঠন যৌতুকের কারণে নির্যাতিত মানুষের পাশে দাঁড়াবে এবং তাদের সব ধরনের সহায়তাসহ আইনি সহায়তাও দেবে। তাছাড়া, এ সংগঠন যৌতুকবিরোধী সভা, পদযাত্রা এবং র‍্যালি করতে পারে। এতে সব মানুষের মধ্যে সচেতনতা তৈরি হবে এবং যৌতুকের থাবা থেকে রক্ষা পাবে আমাদের সমাজ।

অনুশীলনমূলক কাজ

কাজ- ১ : ১৯৮৬ সালের যৌতুক নিরোধ আইনে অপরাধীর কী ধরনের শাস্তির বিধান করা হয়েছে তা লেখ।

কাজ- ২ : যৌতুকের কুফল সম্পর্কে সচেতন করার জন্য তুমি কী কী করবে তার একটি তালিকা তৈরি কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. যৌতুক নিরোধ আইন সংশোধন করা হয়েছে কত সালে ?

ক. ১৯৮০ খ. ১৯৮৩

গ. ১৯৮৬ ঘ. ১৯৮৮

২. যৌতুক প্রথা প্রতিরোধে যেসব ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায় তা হচ্ছে–

i . সকলকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত করা

ii. মেয়েদের আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলা

iii. মানুষের মাঝে সচেতনতা তৈরি করা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

জনাব মিজান তার মেয়ে মরিয়মের বিয়ের সময় জামাইকে একটি হোন্ডা দেন। বিয়ের কিছুদিন পর মরিয়মের শ্বশুর বাড়ির লোকজন তাকে টাকা আনতে বাবার বাড়ি পাঠায়। মরিয়ম টাকা আনতে ব্যর্থ হয়। ফলে তার উপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন নেমে আসে।

৩. মরিয়ম কোন সামাজিক সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে ?

ক. নিরক্ষরতা খ. যৌতুক
গ. কুসংস্কার ঘ. জনসংখ্যা স্ফীতি

৪. উক্ত সমস্যার কারণ হচ্ছে-

i . দারিদ্র্য
ii. নারীর নির্ভরশীলতা
iii. আইনের দুর্বল প্রয়োগ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. ii ও iii
গ. i ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. নাসিমা বাবা মায়ের একমাত্র সন্তান। নাসিমার সাথে জাহিদের বিয়েতে নাসিমার বাবা মা কিছু মূল্যবান উপহারসামগ্রী ও ব্যবসা করার জন্য ৫ লক্ষ টাকা দিতে চাইলে জাহিদ সেগুলো নিতে রাজি হননি। বরং তিনি তাদেরকে বুঝিয়ে বললেন যে, একজন সচেতন মানুষ হিসেবে এগুলো গ্রহণ করা কিংবা এই কুপ্রথাকে সমর্থন করা তার পক্ষে অসম্ভব। নাসিমার বাবা-মা নিজেদের ভুল বুঝতে পারলেন।

ক. যৌতুক বাংলাদেশের কোন ধরনের সমস্যা?

খ. কন্যা সন্তানকে উচ্চশিক্ষা গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা কর।

গ. নাসিমার বাবা মায়ের প্রস্তাবটি আমাদের দেশের কোন প্রথাটিকে ইঙ্গিত করে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. অনুচ্ছেদে উল্লিখিত প্রথাটির প্রতিরোধে কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায়? তোমার মতামত দাও।

অধ্যায়-এগার

এশিয়ার কয়েকটি দেশ

বাংলাদেশ এশিয়ার একটি ছোট দেশ। আমাদের এশিয়া মহাদেশে এ রকম ছোট ও বড় মোট ২৭টি দেশ রয়েছে। দেশগুলোর কোনোটি বেশ উন্নত আবার কোনো কোনোটি তত উন্নত নয়। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের পর্যায়ে পড়ে সেগুলো। তবে জনগণের জীবনযাত্রার মান, অর্থনৈতিক অবস্থা, ভৌগোলিক ও জলবায়ুগত বৈশিষ্ট্য এবং ইতিহাস ও সংস্কৃতির দিক থেকে এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে অনেক মিল রয়েছে। এশিয়ার বহুদেশের সঙ্গেই বাংলাদেশের রয়েছে চমৎকার বন্ধুত্ব। শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, বাণিজ্য, শিল্প, প্রযুক্তিসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের সঙ্গে আমাদের সহযোগিতার সম্পর্ক আছে। এখানে আমরা বাংলাদেশের সঙ্গে নিবিড় বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার সম্পর্ক রয়েছে এমন কয়েকটি দেশের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরছি।

পাঠ-১: বাংলাদেশের সঙ্গে বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার সম্পর্ক

ভারত

ভারত আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী। এটি দক্ষিণ এশিয়ার একটি বৃহৎ ও শক্তিশালী রাষ্ট্র। এশিয়া মহাদেশের মধ্য-দক্ষিণে ভারতের অবস্থান। এর উত্তরে রয়েছে পৃথিবীর বৃহত্তম হিমালয় পর্বতমালা। পূর্বাঞ্চলে আরাকান পর্বত ও আসামের জঙ্গল। পশ্চিমাঞ্চলে হিন্দুকুশ ও সুলেমান পর্বতমালা। দেশটির দক্ষিণে ভারত মহাসাগর অবস্থিত। ভারতের

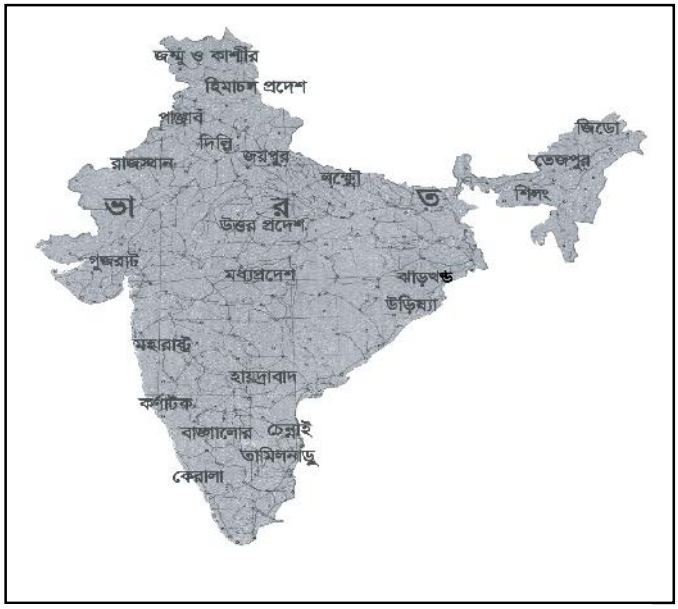

ভারতের মানচিত্র

আয়তন প্রায় ৩২ লক্ষ ৮৭ হাজার বর্গকিলোমিটার এবং জনসংখ্যা প্রায় ১২০ কোটি। দেশটির রাজধানী নয়াদিল্লি ।

ভারতকে পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন ও সভ্যতাসমৃদ্ধ দেশ বলা হয়। পাঁচ হাজার বছর আগের সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গেছে এ দেশটিতে। দক্ষিণ ভারতে অজন্তা পর্বতগুহার চিত্রকর্ম, সারা দেশে ছড়িয়ে থাকা অজস্র প্রাচীন মন্দির ও ভাস্কর্য, আগ্রার তাজমহল, দিল্লির কুতুব মিনার, লালকেল্লা প্রভৃতি ভারতের প্রাচীন সভ্যতার পরিচয় বহন করে। যুগে যুগে বিভিন্ন বৈদেশিক শক্তি ভারতবর্ষকে দখল করেছে, এখানে তাদের শাসন ও শোষণ চালিয়েছে। পর্তুগিজ, ওলন্দাজ, মুঘল, পাঠান ও সর্বশেষ ইংরেজরা ভারতবর্ষকে শাসন করেছে। দুশ বছরের ইংরেজ শাসনের পর ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট ভারত স্বাধীনতা লাভ করে। দেশটির শতকরা ৮০ ভাগ লোক গ্রামে এবং ২০ ভাগ লোক শহরে বাস করে। শতকরা ৭০ ভাগ লোক কৃষিজীবী। প্রধান খাদ্যশস্যের মধ্যে ধান, গম, বার্লি, যব, কফি, চা উল্লেখযোগ্য। প্রাচীনকাল হতে ভারত তার বস্ত্রশিল্পের জন্য সারা পৃথিবীতে বিখ্যাত ছিল। বর্তমানে ইস্পাত, সিমেন্ট, যন্ত্রপাতি, রাসায়নিক দ্রব্য, সার এমন কি জাহাজ ও গাড়ি তৈরিতেও ভারত এগিয়ে গেছে।

ভারতকে বলা হয় পৃথিবীর বৃহত্তম গণতান্ত্রিক দেশ। সংসদীয় গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা বহু বছর ধরে ভারতে সাফল্যের সঙ্গে কাজ করছে।

ভারত বহুজাতি, সম্প্রদায় ও ভাষাগোষ্ঠীর মানুষের একটি দেশ। এ দেশে হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, শিখ, খ্রিষ্টান, জৈনসহ বহু ধর্মের লোক বাস করে। বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে। ১৯৭১ এর মহান মুক্তিযুদ্ধে ভারতের সহায়তার কথা আমরা স্মরণ করি।

চীন

চীন পূর্ব-এশিয়ার একটি দেশ। এর রাষ্ট্রীয় নাম গণপ্রজাতন্ত্রী চীন, আর স্থানীয় নাম ঝুংঘু। দেশটির রাজধানীর নাম বেইজিং। প্রায় ১৪০ কোটি মানুষ নিয়ে এটি বিশ্বের সর্বাধিক জনসংখ্যার দেশ। আয়তন প্রায় ৯৫ লক্ষ ৯৭ হাজার বর্গকিলোমিটার। আয়তনের দিক থেকে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম দেশ এটি। ভৌগোলিকভাবে ভারত ও রাশিয়ার মধ্যখানে দেশটির অবস্থান। এর পূর্বে প্রশান্ত মহাসাগর, পশ্চিম ও উত্তর দিকে রাশিয়া, মঙ্গোলিয়া এবং ভারতের কিছু অংশ এবং দক্ষিণে হিমালয়। দেশটির স্থলভাগের এক-তৃতীয়াংশের বেশি জুড়ে রয়েছে পাহাড়-পর্বত। বিশ্বের সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ মাউন্ট এভারেস্ট নেপাল ও চীনের সীমান্ত বরাবর অবস্থিত। চীনের জলবায়ু প্রধানত নাতিশীতোষ্ণ। তবে দেশটির কোনো কোনো অঞ্চল বছরের দীর্ঘ সময় বরফে ঢাকা থাকে।

বহুজাতি ও সম্প্রদায়ের বাস এ দেশটিতে। চীনের জনসংখ্যার শতকরা ৯৫ ভাগ হান চাইনিজ বংশোদ্ভূত। এছাড়াও রয়েছে আরোও ৫৬টি জাতির বসবাস। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো জুয়াং, মাঞ্চু, হুই, মিয়াও, উইঘুর, মোঙ্গল, তিব্বতি প্রভৃতি। চীনের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ভাষা হলো মান্দারিন। জনসমষ্টির শতকরা ৯৫ ভাগ এ ভাষায় কথা বলে। তবে এ ভাষা সারা বিশ্বে চীনা ভাষা নামে পরিচিত।

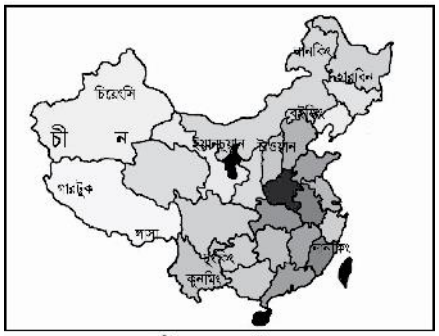

চীনের মানচিত্র

চীনের অর্থনীতি এখনও প্রধানত কৃষিনির্ভর। কৃষিজাত দ্রব্যের মধ্যে ধানই প্রধান। অন্যান্য কৃষিজাত দ্রব্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে গম, আলু, বীট, তুলা, চা, তামাক পাতা, তেলবীজ, আখ, সয়াবিন, কোকো, পামতেল প্রভৃতি। দেশটির প্রধান শিল্প লৌহ, ইস্পাত, রেশম, সার, যন্ত্রপাতি, সিমেন্ট, কাগজ, চিনি, ঔষধ প্রভৃতি। খনিজ সম্পদের দিক থেকেও চীন অত্যন্ত সম্পদশালী। দেশটির ভূগর্ভে রয়েছে মূল্যবান খনিজ সম্পদ, যেমন-পেট্রোলিয়াম, আকরিক লৌহ, তামা, অ্যালুমিনিয়াম, স্বর্ণ, কয়লা প্রভৃতি। এর বনভূমিতে রয়েছে ৩২ হাজারেরও বেশি উন্নত প্রজাতির উদ্ভিদ ও সাড়ে ১১শ প্রজাতির পাখি। হোয়াংহো ও ইয়াংসি চীনের বৃহত্তম নদী।

প্রশাসনিক দিক থেকে চীনকে ২২টি প্রদেশ এবং ৫টি স্বায়ত্বশাসিত অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে। দেশটির শিক্ষার হার শতকরা ৮৬ ভাগ এবং মাথাপিছু আয় ২৫ হাজার মার্কিন ডলার। বাংলাদেশের সঙ্গে চীনের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আছে। শিল্প ও বাণিজ্য ক্ষেত্রে চীনের সাথে আমাদের সহযোগিতার সম্পর্কও রয়েছে।

অনুশীলনমূলক কাজ

কাজ- ১ : আমাদের নিকট প্রতিবেশী কয়েকটি রাষ্ট্রের নামের তালিকা তৈরি কর।

কাজ- ২ : পাঠ্যপুস্তক অবলম্বনে ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্কের গুরুত্ব উল্লেখ কর।

কাজ- ৩ : চীনের সঙ্গে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সম্পর্কের বিবরণ দাও।

পাঠ : ২ বাংলাদেশের সঙ্গে বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার সম্পর্ক

জাপান

জাপান পূর্ব এশিয়ার একটি দ্বীপময় দেশ। ছোট-বড় প্রায় চার হাজার দ্বীপ নিয়ে এ রাষ্ট্রটি গঠিত। এর মধ্যে প্রধান চারটি দ্বীপ হলো হোক্কাইডো, হন্‌সু, শিকোকু এবং কিউশু। দেশটির চারদিকেই সমুদ্র। জাপান সাগর এবং পূর্বচীন সাগর জাপানকে এশিয়া মহাদেশের মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে।

দেশটির রাষ্ট্রীয় নাম কিংডম অব জাপান ও স্থানীয় নাম নিহন বা নিপ্পন। এর রাজধানী টোকিও। এশিয়া মহাদেশের একেবারে পূর্ব প্রান্তে এ দেশটি অবস্থিত। জাপানকে তাই 'সূর্যোদয়ের দেশ'ও বলা হয়। আয়তনের দিক থেকে জাপান একটি ক্ষুদ্র দেশ। ৩ লক্ষ ৭৮ হাজার বর্গকিলোমিটার আয়তনের এ দেশটিতে প্রায় ১৩ কোটি লোক বাস করে। জাপানের শতকরা ৯৯ ভাগ মানুষ জাপানি ভাষায় কথা বলে। এ দেশের শিক্ষার হার একশত ভাগ এবং মাথাপিছু আয় ৩৭ হাজার ৬ শ মার্কিন ডলার। সিন্টো জাপানিদের জাতিগত ধর্ম।

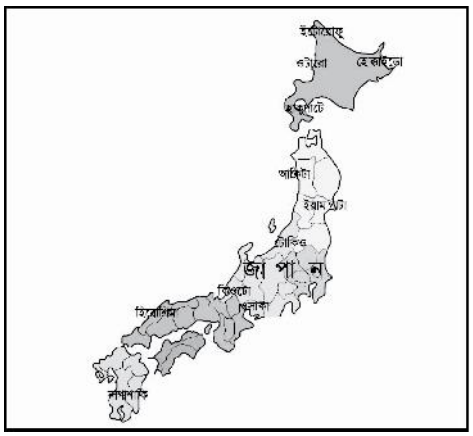

জাপানের মানচিত্র

জাপানের জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ মন্ডলীয়। এখানকার উত্তর-পূর্বাঞ্চলে মৌসুমি জলবায়ুর প্রভাব স্পষ্ট। গ্রীষ্মকালে দেশটির আবহাওয়া আর্দ্র এবং শীতের তীব্রতাও কম। কৃষিপণ্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো ধান, গম, বার্লি, সয়াবিন, মিষ্টি আলু, আখ, বিট,

আপেল ও আঙুর । জাপানের প্রধান শিল্প হচ্ছে লোহা ও ইস্পাত, ইলেকট্রনিক্স, জাহাজ ও গাড়ি নির্মাণ, বস্ত্র, কলকবজা, ঔষধ, বিদ্যুৎ সামগ্রী এবং বিভিন্ন প্রকার ভারী যন্ত্রপাতি। শিল্পে জাপান বিশ্বের শীর্ষস্থানে রয়েছে। দেশটির অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তিই হলো শিল্প। দেশটিতে প্রচুর খনিজ সম্পদও রয়েছে। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো প্রাকৃতিক গ্যাস, কয়লা, লোহা, ম্যাংগানিজ, পেট্রোলিয়াম, সীসা, সোনা, রুপা প্রভৃতি। জাপানে ৬ থেকে ১৫ বছর বয়স পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের শিক্ষা বাধ্যতামূলক। বাংলাদেশের সাথে জাপানের সম্পর্ক বরাবরই অত্যন্ত বন্ধুত্বপূর্ণ। জাপান বাংলাদেশের শিল্প-উন্নয়নে প্রধান সহযোগী। এ দেশের সাথে তাদের বাণিজ্য সম্পর্কও রয়েছে।

কোরিয়া

এশিয়া মহাদেশের উত্তর-পূর্ব কোণে কোরিয়ান উপদ্বীপের অবস্থান। এটি উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকে প্রসারিত। উত্তর হতে দক্ষিণাঞ্চলের দূরত্ব প্রায় ১ হাজার কিলোমিটার। উত্তর দিকের সীমান্তের অধিকাংশই চীনের সাথে এবং কিছু অংশ রাশিয়ার সাথে সংযুক্ত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে কোরিয়া দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। এর একটি দক্ষিণ কোরিয়া এবং অপরটি উত্তর কোরিয়া। প্রথমটির সরকারি নাম কোরিয়া প্রজাতন্ত্র ও দ্বিতীয়টির নাম গণপ্রজাতন্ত্রী কোরিয়া। দুটি দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাও ভিন্ন। কোরিয়ার অধিকাংশ অঞ্চলই পর্বতময়। এর পূর্বে জাপান সাগর। পশ্চিম ও দক্ষিণের অনেকটাই সমতলভূমি। দুই অংশ মিলে কোরিয়ার দ্বীপের সংখ্যা প্রায় তিন হাজার।

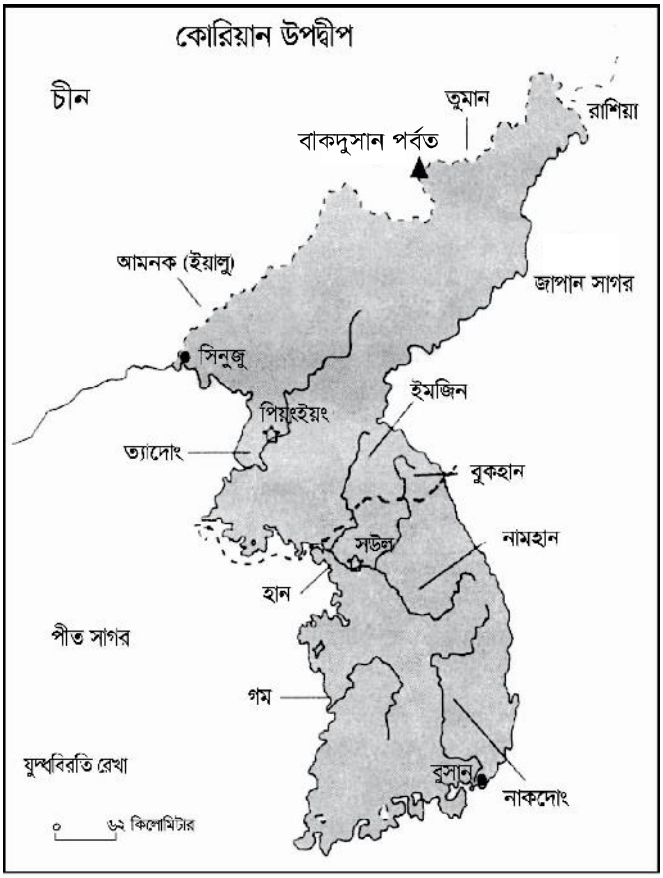

কোরিয়ার মানচিত্র

কোরিয়ায় চার ধরনের ঋতু বিদ্যমান। এছাড়া বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রকম আবহাওয়ার উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। জুন, জুলাই ও আগস্ট মাসে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। নভেম্বর থেকে মার্চ পর্যন্ত শীতকালীন আবহাওয়া বিরাজ করে। কোরিয়ার কৃষি পণ্যের মধ্যে ধান, বার্লি, বাঁধাকপি, আপেল, আঙুর, তামাক প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। শিল্পের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো তেল, সিমেন্ট, লৌহ ও ইস্পাত, তামাক, রাসায়নিক তন্তু, যন্ত্রপাতি, জাহাজ ও মোটরগাড়ি, ইলেকট্রনিক্স সামগ্রী প্রভৃতি। খনিজ সম্পদের মধ্যে রয়েছে লোহা, ট্যাংস্টেন, চুনাপাথর, গ্রানাইট, সীসা, রুপা, দস্তা প্রভৃতি।

কোরিয়ানরা জাতিগতভাবে এক ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। ভাষাগত ও নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়ে কোরিয়ানরা চীন ও জাপানিদের থেকে আলাদা। যদিও শারীরিক গঠনের দিক দিয়ে চীন ও জাপানের মানুষের সাথে তাদের মিল রয়েছে। কোরিয়ানরা সবাই একই কোরিয়ান ভাষায় কথা বলে ও লেখে।

মালয়েশিয়া

মালয়েশিয়া দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ দেশ। মালয় উপদ্বীপ, ব্রিটিশ, সিঙ্গাপুর এবং বর্নিওর উত্তর ও উত্তর-পশ্চিমাংশ নিয়ে মালয়েশিয়া গঠিত। দেশটির ভূপ্রকৃতি বৈচিত্র্যপূর্ণ। এর পশ্চিমাংশে জলাভূমি, পূর্বাংশে বালিময় এলাকা এবং মধ্যভাগের পর্বতশ্রেণি উত্তর ও দক্ষিণে বিস্তৃত।

মালয়েশিয়ায় ইসলাম, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান, হিন্দু প্রভৃতি ধর্মের লোক বাস করে। এর রাজধানীর নাম কুয়ালালামপুর। জর্জটাউন, ইপো ও কুচিং অন্যতম প্রধান শহর।

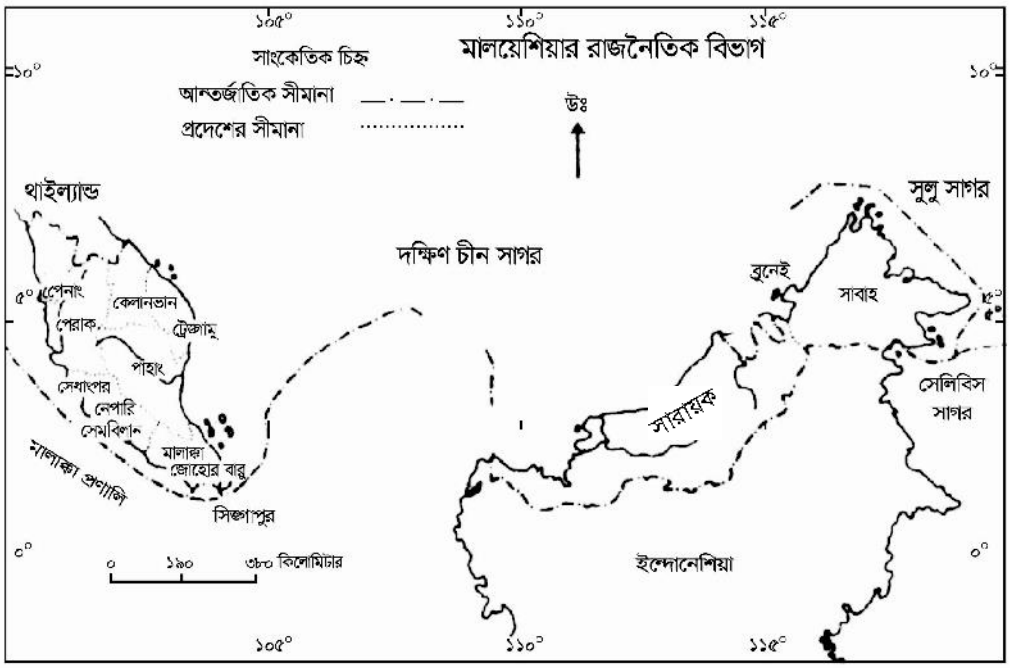

মালয়েশিয়ার মানচিত্র

মালয়েশিয়া একটি কৃষিপ্রধান দেশ। মোট জনসংখ্যার শতকরা ৫০ ভাগেরও বেশি কৃষির উপর নির্ভরশীল। প্রধান শিল্পপণ্যের মধ্যে রয়েছে রাবার, সার, চীনামাটির দ্রব্য প্রভৃতি। খনিজ সম্পদের মধ্যে টিন, লোহা এবং পেট্রোল উল্লেখযোগ্য। যোগাযোগের প্রধান মাধ্যম হলো রেল পথ, সড়ক পথ ও বিমানপথ। জর্জটাউন, ক্ল্যাঙ্গ, কুচিং এবং পেনাং মালয়েশিয়ার প্রধান সমুদ্রবন্দর। স্বাধীনতার পর স্বল্প সময়ের মধ্যে মালয়েশিয়া নানা ক্ষেত্রে উন্নতি লাভ করেছে।

অনুশীলনমূলক কাজ

কাজ- ১ : এ পাঠ অবলম্বনে জাপান ও কোরিয়ার পরিচয় দাও।

কাজ- ২ : মালয়েশিয়া মূলত কৃষি প্রধান না শিল্প প্রধান দেশ? আমাদের সঙ্গে এ দেশের কী ধরনের অর্থনৈতিক সম্পর্ক রয়েছে তোমার জানামতে তার আলোচনা কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কুচিং কোন দেশের প্রধান সমুদ্রবন্দর?

ক. কোরিয়া খ. জাপান
গ. ভারত ঘ. মালয়েশিয়া

২. জাপানের জলবায়ুতে পরিলক্ষিত হয়–

i . মৌসুমি বায়ুর প্রভাব
ii. আদ্রতাপূর্ণ গ্রীষ্মকাল
iii. বৃষ্টিবহুল শীতকাল

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

শিল্পোদ্যোক্তা জনাব আদনান পূর্ব-এশিয়ার শিল্পনির্ভর একটি দেশ পরিদর্শনে যান। দেশটি সমুদ্রবেষ্টিত। দেশটির জাতিগত ধর্ম সিন্টো।

৩. জনাব আদনান কোন দেশ পরিদর্শনে যান?

ক. ভারত খ. চীন
গ. জাপান ঘ. মালয়েশিয়া

৪. আদনানের দেখা দেশটি শিল্পনির্ভর হওয়ার কারণ হচ্ছে–

i . উন্নত জীবনযাত্রা
ii. খনিজ সম্পদের প্রাচুর্য
iii. উষ্ণমণ্ডলীয় জলবায়ুর প্রভাব

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii খ. i ও iii
গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. অনিন্দ্য গ্রীষ্মের ছুটিতে মা-বাবার সাথে বাংলাদেশের পার্শ্ববর্তী একটি দেশে যায়। দেশটির উত্তরে হিমালয় পর্বতমালা এবং পশ্চিমে হিন্দুকুশ ও সুলেমান পর্বতমালা। দেশটি প্রাচীন শিল্পকলা ও সভ্যতা সমৃদ্ধ।

ক. মালয়েশিয়ার রাজধানীর নাম কী ?

খ. বহুজাতি দেশ বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর।

গ. অনিন্দ্যের ভ্রমণকৃত দেশটির সাথে বাংলাদেশের জলবায়ুর সাদৃশ্য বর্ণনা কর।

ঘ. অনিন্দ্যের ভ্রমণকৃত দেশের সাথে বাংলাদেশের বন্ধুত্ব ও সহযোগিতামূলক সম্পর্কের গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর।

২. **ঘটনা ১ :** জনাব সাফিউল দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার একটি দেশে বেড়াতে গিয়েছেন। সমুদ্রবেষ্টিত দেশটির প্রাকৃতিক দৃশ্য অত্যন্ত মনোরম। দেশটি দ্বীপ প্রধান হলেও চারটি দ্বীপই অর্থনীতির ক্ষেত্রে মূল ভূমিকা রাখছে।

ঘটনা ২ : জনাব কবীর দীর্ঘদিন যাবৎ পূর্ব এশিয়ার একটি দেশে কর্মরত আছেন। দেশটি পৃথিবীর মধ্যে সর্বাধিক জনবহুল দেশ হলেও সমৃদ্ধ।

ক. পৃথিবীর বৃহত্তম পর্বতমালার নাম কি ?

খ. ভারতকে পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন সভ্যতা সমৃদ্ধ দেশ বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর।

গ. জনাব সাফিউলের বেড়াতে যাওয়া দেশটির জলবায়ু কেমন? বর্ণনা কর।

ঘ. ঘটনা-১ ও ঘটনা-২ এর দেশ দুটির অর্থনীতির তুলনামূলক বিশ্লেষণ কর।

অধ্যায়-বার

আঞ্চলিক সংস্থা

পৃথিবীর কোনো দেশই এককভাবে স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়। প্রতিটি দেশকেই কোনো না কোনোভাবে অন্য দেশের উপর নির্ভর করতে হয়। প্রতিটি দেশই চায় নিজের জনগণের চাহিদা পূরণ করতে, সেই সঙ্গে নিজেকে উন্নত বা সমৃদ্ধ করতে। আর এর জন্য তাকে প্রতিবেশী বা অন্য দেশের কমবেশি সাহায্য-সহযোগিতা নিতে হয়। দেশগুলোর মধ্যে এই পারস্পরিক সহযোগিতার উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই সারা পৃথিবীতে অনেকগুলো সংস্থা বা জোট গড়ে উঠেছে। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর সমন্বয়ে গঠিত এমনি তিনটি সংস্থা হলো সার্ক, আসিয়ান ও বিমসটেক। এখানে আমরা উক্ত তিনটি আঞ্চলিক সংস্থা সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করব।

পাঠ- ১ ও ২ : এশিয়ার কয়েকটি আঞ্চলিক সংস্থা

সার্ক (SAARC) : দক্ষিণ এশিয়ায় সাতটি দেশ বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, নেপাল, ভুটান, শ্রীলংকা ও মালদ্বীপ নিয়ে ১৯৮৫ সালে সার্ক গঠিত হয়। ১৯৮৩ সালের ২রা আগস্ট ভারতের রাজধানী নয়াদিল্লিতে দক্ষিণএশিয়ার এই সাতটি দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রীরা এক চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন, যার ফলে আনুষ্ঠানিকভাবে গঠিত হয় 'সার্ক'। সংস্থাটির পুরো নাম South Asian Association for Regional Cooperation-যার বাংলা করলে হয় 'দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা'। কৃষি, আবহাওয়া, পল্লি উন্নয়ন, বিজ্ঞান, যোগাযোগ, শিক্ষা, পরিবেশ ও কারিগরি ক্ষেত্রসহ ৯টি ক্ষেত্রে সহযোগিতার উল্লেখ ছিল এই চুক্তিতে। পরবর্তী সময়ে ২০০৫ সালে আফগানিস্তান সার্কের সদস্যপদ লাভ করে। সার্কের বর্তমান সদস্য সংখ্যা আট। সংস্থাটির সদর দপ্তর নেপালের কাঠমুন্ডুতে অবস্থিত। পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমে বিভিন্ন আঞ্চলিক সমস্যার সমাধান ও সার্কভুক্ত দেশগুলোর উন্নয়ন এ সংস্থার প্রধান লক্ষ্য। তাছাড়া এই সাত জাতির নেতৃবৃন্দ সন্ত্রাস, এইচআইভি/এইডস, বাণিজ্য বিনিয়োগ, শিক্ষা ও পরিবেশ উন্নয়নেও পারস্পরিক সহযোগিতার ব্যাপারে একমত হয়েছেন।

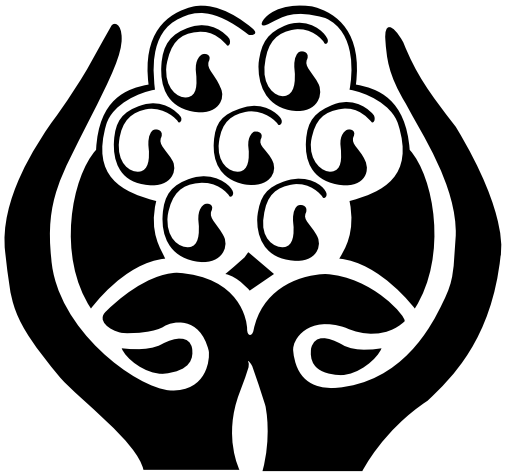

সার্ক এর প্রতীক

আসিয়ান (ASEAN) : এটি দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর একটি আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা। সংস্থাটির পুরো নাম Association of South East Asian Nations, বাংলায় 'দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় জাতিসমূহের সংস্থা'। **ASEAN** এর প্রতিষ্ঠা সাল ৮ই আগস্ট ১৯৬৭। দশটি দেশ নিয়ে এ সহযোগিতা সংস্থা গঠিত হয়। দেশগুলো হলো ইন্দোনেশিয়া, সিঙ্গাপুর, ফিলিপাইনস, মালয়েশিয়া, থাইল্যান্ড, ব্রুনাই, ভিয়েতনাম, মিয়ানমার, কম্বোডিয়া ও লাওস। আসিয়ানের সদর দপ্তর ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী জাকার্তায় অবস্থিত। সংস্থার প্রধান লক্ষ্য হলো সদস্য দেশগুলোর সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি উন্নয়নের ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতা করা।

আসিয়ান এর প্রতীক

বিমসটেক (BIMSTEC) : বিমসটেক এর পুরো নাম Bay of Bengal Initiative for Multi Sector Technical & Economic Cooperation। বঙ্গোপসাগর তীরবর্তী দক্ষিণএশিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে প্রযুক্তিগত ও অর্থনৈতিক সহযোগিতার লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালের ৬ই জুন এ সংস্থাটির জন্ম হয়। এর সদস্য রাষ্ট্রগুলো হলো বাংলাদেশ, শ্রীলংকা, থাইল্যান্ড, মিয়ানমার, নেপাল ও ভুটান। বর্তমানে সদস্য রাষ্ট্রগুলোর সহযোগিতার ক্ষেত্র আরও সম্প্রসারিত হয়েছে। বাণিজ্য, বিনিয়োগ, প্রযুক্তি, পর্যটন, মানবসম্পদ উন্নয়ন, কৃষি, মৎস্য চাষ, পরিবহন ও যোগাযোগ, ঔষধ, বস্ত্র, চামড়া, কৃষি প্রভৃতিও এর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

বিমসটেক এর প্রতীক

অনুশীলনমূলক কাজ

কাজ- ১ : আঞ্চলিক সহযোগিতার প্রয়োজন কেন- এ বিষয়ে তোমার মতামত ব্যক্ত কর।

কাজ- ২ : সার্ক বলতে কী বোঝায়? এ জোটের অন্তর্ভুক্ত রাষ্ট্রগুলোর নাম লেখ।

কাজ- ৩ : সার্ক-এর প্রধান কাজ কী কী?

কাজ- ৪ : আসিয়ান কোন কোন রাষ্ট্র নিয়ে গঠিত?

কাজ- ৫ : বিমসটেক কী? এর অন্তর্ভুক্ত রাষ্ট্রগুলোর নাম উল্লেখ কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. সার্কভুক্ত দেশ কোনটি?

ক. মালদ্বীপ খ. ইন্দোনেশিয়া
গ. মালয়েশিয়া ঘ. ভিয়েতনাম

২. বিমসটেক গঠিত হয়েছিল-

i. পরস্পরের প্রযুক্তি ও অর্থের অভাব দূর করার জন্য
ii. বিনিয়োগ ও বাণিজ্যের ঘাটতি পুরণের লক্ষ্যে
iii. পরিবেশ দূষণের ভয়াবহতা থেকে মুক্তি পেতে

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii
গ. i ও ii ঘ. i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও।

ভুটানে দক্ষিণ এশিয়ার ৮টি দেশের একটি সংস্থার সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতে দেশগুলো পারস্পরিক বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে এবং কয়েকটি চুক্তি সম্পাদন করে।

৩. অনুচ্ছেদে কোন সংস্থার সম্মেলনের কথা বলা হয়েছে?

ক. আসিয়ান খ. বিমসটেক
গ. সার্ক ঘ. ইইসি

৪. উক্ত সংস্থা গঠনের কারণ, সদস্য দেশগুলোর মধ্যে-

i. কৃষি বিষয়ক সহযোগিতা বৃদ্ধি করা
ii. বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা বিনিময়
iii. পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i খ. ii ও iii
গ. i ও ii ঘ. i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. আঞ্চলিক সংস্থার কিছু তথ্য:

সংস্থার নাম	প্রধান কার্যালয়	সর্বশেষ সদস্য	বর্তমান সদস্য
ক.	জাকার্তা	কম্বোডিয়া	১০
খ.	কাঠমুণ্ডু	আফগানিস্তান	০৮
গ.	ব্যাংকক	• নেপাল • ভুটান	০৬

ক. ভারতের রাজধানীর নাম কী?

খ. আঞ্চলিক সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা কর।

গ. 'ক' ও 'গ'–সংস্থার লক্ষ্য একই- ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'খ সংস্থাটির সদস্য হিসেবে বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণে সংস্থার সকল রাষ্ট্রের সহযোগিতা লাভ করবে'- উক্তিটি বিশ্লেষণ কর।

২. সম্প্রতি পূর্ব ইউরোপের কয়েকটি দেশ মিলে একটি সংস্থা গঠন করে। সংস্থাটি মূলত কয়েকটি ক্ষেত্রে সহযোগিতার লক্ষ্য নিয়ে গঠিত হয়। ক্ষেত্রগুলো হচ্ছে- (১) সামাজিক (২) অর্থনৈতিক (৩) সাংস্কৃতিক (৪) বৈজ্ঞানিক (৫) কারিগরি (৬) সন্ত্রাসবাদী তৎপরতা রোধ এবং (৭) বিভিন্ন সংক্রামক ব্যাধি নিয়ন্ত্রণে পারস্পরিক সহযোগিতা করা।

ক. ২০০৫ সালে কোন দেশ সার্কভুক্ত হয়?

খ. বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন দেশের জোট গড়ে উঠার কারণ বর্ণনা কর।

গ. অনুচ্ছেদে বর্ণিত সংস্থাটির ১ থেকে ৫ পর্যন্ত ক্ষেত্রগুলো তোমার পঠিত কোন সংস্থার অনুরূপ ব্যাখ্যা কর।

ঘ. '৭ নম্বর ক্ষেত্রটি বিমসটেক গঠনের একমাত্র লক্ষ্য'-উক্তিটির পক্ষে তোমার যুক্তি উপস্থাপন কর।

২০১৬
শিক্ষাবর্ষ
৭-বা বি

শিক্ষাই দেশকে দারিদ্র্যমুক্ত করতে পারে
– মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

আলস্য দোষের আকর

২০১০ শিক্ষাবর্ষ থেকে সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণ ও বাঁধাইয়ে :